অপরাহ্নের আলো

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

সুজন পাবলিকেশনস্
কলিকাতা-২৯

উৎসর্গ

প্রয়াত সুহৃদ সহকর্মী সত্যনিষ্ঠ সাংবাদিক ফণীভূষণ চক্রবর্তীর
স্মৃতির উদ্দেশে

সূচীপত্র

অপরাহ্ণের আলো

আজ সকালেই সাধনা মুচিটাকে অনেক সাধ্যসাধনা করে চটিটা সারিয়েছে। অনুনয়ের দরকার ছিল। কারণ সেটা দেখে সে বলেছিল, ইঠো আর চলবে না দিদি। নোতুন একঠো কিনেন এখুন।

তখন চটতে পারেনি সে, রেগে উঠল দুপুরে বাড়ী ফেরার পর যখন ওর একমাত্র তোলা শাড়ীটা সেলাই করার চেষ্টায় ব্যর্থ হযে মা-ও একই কথা বললেন, এ আর চলবে না, মা। এবার একটা কিনতেই হবে। ফোঁস করে উঠল সাধনা, শুধু শাড়ী কেন, জুতো ব্লাউজ সবই তো কিনতে হবে। টাকা কোথা! তুমি জানো না, চারমাস ধরে টিউশনি নেই? জানো না, ছ মাসের বাড়ী ভাড়া, তিন মাসের দোকানে বাকী! মাসের প্রথমে আনা হয়েছিল, নইলে না খেয়ে শুকিয়ে থাকতে হতো। তোমার আর কি? তোমাকে তো সুধন্যকাকা আর জগা মুদীর কাছে অপমানের কথাগুলো শুনতে হয় না। বলতে বলতে কেঁদে ফেলল সে।

মা কোন জবাব না দিয়ে নতমুখে জীর্ণ শাড়ীখানা আবার তুলে নিলেন রিপু করার জন্য। প্রথম প্রথম এই শাড়ীখানা হাতে নিলে অনেক স্মৃতি মনে পড়তো, চোখে জল আসতো। কারণ এখানা ওঁর ফুলশয্যার শাড়ী। এখন সে স্মৃতিবিলাস মরে গেছে। এখন শুধু সন্ধানী শ্যেন দৃষ্টিতে বিচার করেন, আরো কয়েকদিন এটাকে চালানো যায় কিনা। চালাতেই হবে। কারণ সাধনাকে বাইরে বার হতে হবে, চাকরি খুঁজতে হবে।

এরই মধ্যে বিকালবেলা অপ্রত্যাশিতভাবে চিঠিটা এল। হ্যাঁ, ইন্টারভিউর চিঠিই। চিঠিটা হাতে নিয়ে সাধনা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। খুব যে একটা উৎসাহ পেল তা নয়। কারণ এর আগে দশ বারোটা ইন্টারভিউ ও পেয়েছে, কিন্তু চাকরি পায়নি। তবু হঠাৎ যদি লটারী পাওয়া যায় তেমনি একটা ক্ষীণ আশা জেগে উঠল ধীরে ধীরে। এবং তারপরই মনে হ'ল শাড়ী আর ছেঁড়া চটিটার কথা। সঙ্গে সঙ্গে নজর গেল ব্লাউজটার দিকে। প'রে এখানে ওখানে ঘোরাঘুরি হয়তো করা যায়, কিন্তু চাকরির ইন্টারভিউ

দিতে যাওয়া যায় না। দিনে দিনে এগুলো আরো জীর্ণ অব্যবহার্য হয়েছে কিন্তু নতুন কেনা যায়নি।

কী করবে সে? নন্দিতার কাছে একখানা শাড়ী একদিনের জন্য ধার করা যায়, কিন্তু ওর ব্লাউজ বা চটি ওকে ফিট্ করবে না। সুতরাং একজোড়া চটি এবং একটা ব্লাউজ ওকে কিনতেই হবে। মায়ের ওপর রাগ দেখিয়ে এখন খুব খারাপ লাগছে। এখন তো ওকে কিছু খরচ করতেই হবে যেভাবেই টাকা পাক। মা আর সাধনা দুজনে মিলে এখানে ওখানে হাতড়ে দেখল, যদি দৈবক্রমে দুএকটা দশ কি পাঁচ টাকার নোট কোথাও পড়ে থাকে। এমনও তো হতে পারে কখনো কোথাও রেখেছে, তারপর ভুলে গেছে। কিন্তু ভুলেই গেছে সাধনা যে এ সব জায়গা বহুবার ও খুঁজেছে, কিছুই পায়নি। আজও পেল না।

সাধনাকে আজ বাড়ী ভাড়া, দোকানের দেনা এবং একখানা শাড়ী ধারের কথা ভাবতে হচ্ছে। পাঁচটা টাকার জন্য বিছানা তোরঙ্গ তোলপাড় করতে হচ্ছে। অথচ এমন একদিন ছিল যখন ওদের নিজেদের বাড়ী ছিল, গাড়ী ছিল। শাড়ী-ব্লাউজ উপচে পড়ত আলমারী থেকে আলনায়। গহনা ছিল পা থেকে মাথা অবধি এবং ড্রেসিং টেবিলের উপর সাজানো থাকতো দামী বিদেশী এসেন্স পাউডার। সেদিন সাধনার বাবা বেঁচেছিলেন, পৈত্রিক ব্যবসা ছিল জোরদার। বিনোদবাবু একমাত্র মেয়ের সাধ-আহ্লাদ মেটাতে কার্পণ্য করেননি। শ্যামলী সাধারণ মেয়েকে অসাধারণ করে তুলতে চেয়েছিলেন আভরণে প্রসাধনে। সাধনা সেদিন প্রসাধনবিলাসিনী ছিল।

আভরণ আর প্রসাধনের উপাদানগুলি কিন্তু সাধনা নিজেই একদিন ছুঁড়ে ফেলেছিল। প্রতিজ্ঞা করেছিল কোনদিনই আর সে সাজসজ্জা করবে না। শাড়ীগুলি দান করে দিয়েছিল একে ওকে।

ঘটনাটা ঘটেছিল ওর ম্যাট্রিক পাশ করার আগে। মা বাবা আত্মীয়-স্বজনেরা বিয়ের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন, কারণ ওদের ঘরে বেশী বয়সের অবিবাহিতা বা লেখাপড়া জানা মেয়ে থাকলে অপযশ হয় এবং বিয়ে দেওয়া মুস্কিল হয়ে পড়ে। তা ছাড়া সাধনা তেমন সুন্দরীও নয় সে কথা জানতো সাধনা। সুতরাং বারো বছর বয়স থেকেই আর দশজন মেয়ের মত সলজ্জভাবে সুসজ্জিত হয়ে বসতে হচ্ছিল তাকে ভাবী শ্বশুর

শাশুড়াদের সামনে।

পাউডার মাখলে যদি একটু ফর্সা দেখায়, চোখের কোণে ভ্রূতে কাজল দিলে যদি বড় বড় টানা দেখায়, গহনা আর শাড়ীতে যদি সুন্দর দেখায় এবং তার ফলে সুপুরুষ বিত্তবান স্বামী লাভ হয় তাতে আপত্তি কি? সুতরাং সাজার আর্টটা আয়ত্ত করেছিল সাধনা। বিয়ের জন্ত খুব যে আগ্রহ ছিল তা নয়। হয় হবে, না হয় ক্ষতি নেই। চলছিল এমনি সাজসজ্জা, নতুন নতুন ভাবী আত্মীয় দেখার, কনে হওয়ার স্বপ্ন-স্বপ্ন খেলা।

হঠাৎ একদিন খেলা ভেঙে গেল।

কনে দেখতে এসে বর্ষিয়সী এক মহিলা, বোধ হয় পাত্রের পিসীমা, হঠাৎ কাছে ডেকে নিয়ে ভ্রূতে হাত দিয়ে ঘষে নিলেন আঙুলটা। চমকে উঠে মাথা সরাতে সরাতে আরো কেলেঙ্কারী। চোখের কাজল, পাউডারের প্রলেপ মুছে লেপ্টে একাকার বাভৎস। ক্রুদ্ধস্বরে স্তম্ভিত সাধনা বলল, একি করছেন আপনি?

সাধনার মাসী ছিলেন পাশে। ব্যাপারটা সামলাবার জন্ত বললেন, তুমি যাও, সাধনা। ও ঘরে যাও।

ততক্ষণে আয়নার দিকে নজর পড়তে ক্ষেপে উঠেছে সাধনা। বলল,— না, ওঁকে বলতে হবে কেন এমন করলেন। তখন সে ক্লাস টেনে উঠেছে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসম্মানজ্ঞানও বেড়েছে।

বর্ষিয়সী বললেন, বলাবলির কি আছে, বাছা? সোনা বলে গিল্টি চালাবার চেষ্টা করলে দেখে নিতে হবে না? আমার ভাইপোর বাপু রাজপুত্তুরের মত চেহারা। তার পাশে কেল্‌টিমেল্‌টি একটা হেঁজিপেঁজি হাজির করলেই তো হবে না। বাজিয়ে দেখে নিতে হবে। যদি বলতে নাচ জানি, তো নাচও দেখে নিতাম। আমার নাম মহামায়া সেন, হ্যাঁ। সাধে এত থাকতে সরোজ আমায় পাঠায়?

সাধনার মা তখন ওকে ঠেলছেন, তুই ভিতরে যা। সব জায়গায় কথা বলতে নেই। কিন্তু তখন সাধনার মাথায় রক্ত উঠেছে। বলল, তা আপনার ভাইপো যদি নাচিয়ে গাইয়ে অপ্সরা চান, তো বাইজী বিয়ে করলেই পারেন।

মহামায়া দেবী হুঙ্কার দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, কি বললে? যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। ছোটলোকের বিটি, আস্পদ্দা দেখ। ভাগ্যিস্ বাজিয়ে দেখলাম—নইলে ছি ছি ছি—

তারপর কি হয়েছিল দেখেনি সাধনা, মাসীমা টেনে এনেছিলেন ঘর থেকে।

নিজের ঘরে এসে সে প্রথমে ভেঙেছিল ওর ড্রেসিং টেবিলটা তারপর ছুঁড়ে ফেলেছিল স্নো-পাউডারের কৌটো, রুজ-কুমকুমের শিশি, লিপষ্টিক আর কাজললতা। কাপড়গুলোও বোধহয় ছিঁড়তো কুচিকুচি করে। আলমারী খোলার আগেই বিন্দি ঝি মাকে ডেকে এনেছিল।

তারপর থেকে সাধ্যসাধনা করেও সাধনাকে আর সাজানো যায়নি। বলেছিল, সঙ সেজে কনে হতে আমি পারবো না। বিয়ে যদি না হয়, না হবে! তোমরা কি খেতে দিতে পারবে না?

মা বলেছেন, কথা দেখো মেয়ের। বিয়ে না করলে চলে মেয়েমানুষের?

—কেন চলবে না? আমাদের দিদিমণিরা অনেকেই তো বিয়ে করেনি।

মা রাগ করে বলেছেন, তাহলে তুমিও দিদিমণি হবে?

সাধনা জবাব দিয়েছে—হবো। তাই হবো। লেখাপড়া করবো এবার থেকে ভাল করে।

—চারটে হাত বেরুবে তাহলে। সারা জীবন ওই করে চলবে?

—অনেকেরই যদি চলে আমার-ও চলবে। মোটকথা আমি আর সঙ সেজে অপমান হতে পারবো না।

অশিক্ষিতা মা একমাত্র সন্তান লেখাপড়া শেখা জেদী মেয়ের কাছে হার মেনেছিলেন। —বেশ মা, তোমাকে আর দশ জনের কাছে হাজির হতে হবে না। কপালে যা আছে তাই হবে।

অপমানটা বাবার গায়েও লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন, মেয়েকে যদি কেউ আদর করে নিয়ে যায় তো যাবে। সেধে অপমান হতে আর যাবে না।

আদর করে কেউ ওকে বরণ করতে আসেনি, কারণ সাধনা সুন্দরী ছিল না এবং বাবার টাকার জোরটুকু শেষ হয়ে গিয়েছিল বছর পাঁচেকের মধ্যেই। হঠাৎ লোকসান খেয়ে বাড়ী পর্যন্ত বিক্রী করে দিতে হয়েছিল। তার দু'বছর পরে পঙ্গু অথর্ব অবস্থায় মারা গিয়েছিলেন বাবা। মায়ের এবং ওর গহনাগুলি চিকিৎসার কাজে লেগেছিল। সংসার চলেছিল ইনসিওরেন্সের টাকায়। তারপর চলেছে সাধনার টিউশনির ওপর নির্ভর করে। এবার সাধনার পথে দাঁড়াবার পালা যদি নতুন টিউশনি বা চাকরী না পায়।

ইন্টারভিউ লেটারটা হাতে নিয়ে ভাবতে ভাবতে সাধনা মনস্থির করে ফেললো এ সুযোগ কোন মতেই ছাড়া যায় না। ছ মাস পরে এই প্রথম এসেছে। বয়স আঠাশ পার হয়ে গেছে। আর কোনদিন আসবে কিনা সন্দেহ। আসেও যদি তখন হয়তো সে আর এ ঠিকানায় থাকবে না। ওর কোন ঠিকানাই থাকবে কিনা তারও ঠিক নেই।

শেষ চেষ্টা করবে সে। এ বাসা ছেড়ে পালাবার সম্বল হিসাবে যে বালাটা লুকিয়ে রেখেছিল সেটা বিক্রী করে একখানা শুধু ভাল শাড়ীই নয়, একজোড়া জুতো, একটা লেটেষ্ট ডিজাইনের ব্লাউজ এবং স্নো-পাউডার, কাজল-কুমকুম, ভ্রূ আঁকার পেনসিল সব কিছুই কিনবে। চরমভাবেই সাজবে সে শেষ অভিসারে।

ওরা বলে এ সবের নাকি দাম আছে চাকরীর বাজারে। কে জানে! আগে বিশ্বাস করতো না অবশ্য। নন্দিতার সঙ্গে এই সেদিনও তর্ক করেছে সে এই নিয়ে। বিদ্রূপ করেছে—কি রে অভিসারে যাচ্ছিস নাকি?

নন্দিতা বলেছিল, ঠেকে শিখেছি ভাই, দেখলাম তো অনেক। বি. এ. পাশ করেছি, টাইপও শিখেছি। তবু আমার জায়গায় চাকরী হয় ম্যাট্রিক পাশ মেয়েগুলোর। ওরা চায় মেয়ে কেরাণীরা অন্ততঃ সুশ্রী হবে, স্মার্ট হবে। একটু আধটু ফ্লার্ট করা যাবে। আর না হয় মুখের দিকে তাকিয়েও তো আনন্দ। কাজের জন্য তো ছেলেরা রয়েছে। তা ছাড়া, সুশ্রী মেয়ে অফিসে থাকলে ছেলেদের কাজের আগ্রহও নাকি বেড়ে যায়।

সাধনা বলেছিল—তাই নাকি?

—তাই তো শুনি। মোট কথা, আমার একটা চাকরি চাই-ই যেমন করে হোক।

একটা চটুল ভঙ্গি করে মুখরা আরতি বলেছে, যেমন করেই হোক? তা হলে চাকরীরই বা দরকার কি?

ভ্রূ কুঁচকে নন্দিতা বলেছিল, তার মানে?

—ও: মানে? শুনতে খুব মজা লাগে না? শোন্ তবে। কাসানোভার গল্প পড়েছিস? পড়িসনি? পড়ে দেখিস। কাসানোভা ছিলেন ইতালীর বিখ্যাত এক জুয়াড়ী। জুয়ো খেলে অগাধ টাকা করেছিলেন, এদিকে আবার মনটি ছিল উদার। সাহায্যের জন্য নিঃস্ব কেউ গিয়ে দাঁড়ালে ফেরাতে পারতেন না। মুঠো ভরে বিলিয়ে দিতেন জুয়োর জেতা টাকা। কাসানোভার বদান্যতার কথা শুনে এক দুঃস্থা কাউণ্টেসের তিন মেয়ে গিয়ে

হাজির হলো তাঁর কাছে—মাকে উদ্ধার করুন আপনি। নইলে জেলে যেতে হবে।

তা কাসানোভা কি বললেন জানিস ? বললেন, দেখো মেয়েরা, তোমাদের মা যদি সত্যিই নিঃস্ব হতেন অবশ্যই আমি সাহায্য করতাম। কিন্তু নিঃস্ব তো তিনি নন ? মেয়েরা আশ্চর্য হয়ে বললো, সে কি ? কাসানোভা হেসে বললেন, ঠিকই বলছি আমি। তোমাদের মত রূপসী যুবতী মেয়ে যাঁর তাঁর আবার অভাব কী ? তোমাদের যৌবন আছে, রূপ আছে—

রেগে উঠেছিল নন্দিতা—মুখে উচ্চারণ করতে পারলি তুই কথাগুলো ? তুই না মেয়ে !

সাধনা গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল।—এ ধরনের রসিকতা নাই বা করলি। তা ছাড়া, যৌবন আছে কিনা জানি না, কিন্তু রূপ যে আমাদের নেই সে কথা তো বলে দেবার প্রয়োজন নেই।

অপ্রস্তুত হয়ে আরতি বলেছিল, রাগ করিস না ভাই। একটা গল্প বললাম তোদের। তোরা তো জানিস, তোদের মতই অবস্থা আমার। ধাক্কা খেয়ে খেয়ে মরিয়া হয়ে গেছি। এক এক সময় মনে হয় কি জানিস—থাক্‌গে, তোরা আবার রাগ করবি হয়তো।

চাকরির প্রয়োজন ওদের তিন জনেরই। বিভিন্ন জায়গায় চাকরীর জন্য ঘুরতে ঘুরতে আলাপ হয়েছে ওদের। তারপর বন্ধুত্ব। এই দলে আরও চার জন ছিল। চাকরি পেয়ে দূরে সরে গেছে তারা। তাদের এরা ঈর্ষা করে। গত ছবছর ধরে ইন্টারভিউ দিয়ে আসছে এরা। কিন্তু এখনও চাকরী পায় নি। অথচ যোগ্যতা নেই এমন নয় !

ওদের মত অনার্স ছিল না সাধনার। সুতরাং খুব ভাল করে উত্তর দেবার চেষ্টা করে সে, আর সেই জন্যেই হয়তো নার্ভাস হয়ে পড়ে। ভাবতে থাকে কোন উত্তরে খুশি হবে বিচারকরা। দেরী হয়ে যায় তাতে এবং তার ফলে নিজের ওপর রেগে ওঠে সে। শেষ পর্যন্ত কোন উত্তরই দেওয়া হয় না। অথবা যেটা সে অপ্রতিভভাবে উচ্চারণ করে সেটা সদুত্তর হয় না। অথবা কারণটা হয়তো আরতি, নন্দিতা যা বলে তাই।

এমনি হয়তো সবারই হয়, কিন্তু সাধনার মত এতটা নয় নিশ্চয়ই। অন্য বন্ধুরা পেয়ে গেছে এবং নন্দিতা আরতিও নিশ্চয়ই পাবে। অন্ততঃ ওর তাই ধারণা। এখন মনে হয় নন্দিতা মোটা এবং আরতি রোগাটে হলেও প্রসাধন

করে বলে ওদের অনেক ভাল, বেশী সপ্রতিভ দেখায়। সাধনাও কোন ত্রুটি রাখবে না এবার। ওর প্রয়োজন যে সব চেয়ে বেশী।

ইন্টারভিউটা কাল। এখনও সময় আছে। সারাদিন ধরে সাধনা জেনারেল নলেজের বই ঘাঁটলো এবং লাইব্রেরীতে গিয়ে কাগজের ফাইল দেখলো। সন্ধ্যাবেলায় মায়ের বাধা সত্বেও বালাটা বিক্রি করে পছন্দমত সব কিছু কিনলো। তারপর সাজিয়ে দেখলো নিজেকে। এমন কিছু খারাপ দেখাচ্ছে না। আর পাঁচজনের পাশে সে মাথা উঁচু করেই দাঁড়াতে পারে। সমানে সমানে তর্ক করতে পারে, দাবী করতে পারে। আত্মবিশ্বাস যেন ওর ফিরে আসছে। ওর ফিগারটা ভাল, তাছাড়া রঙ কালো হলেও চোখে ওর একটা দ্যুতি আছে যার জন্য কলেজে কেউ কেউ কাছে আসতে চেয়েছিল।

হঠাৎ সাধনার মনে হল এমনিভাবে যদি সে গত ইন্টারভিউটায় উপস্থিত হতে পারতো তাহলে হয়তো অমনোনীত হত না। হয়তো সে ওই সুবেশ ছোট সাহেবটির কাছে অনুনয়ের বদলে প্রতিকার দাবী করতে পারতো—টেস্টে ভাল করেও কেন তার চাকরি হবে না।

পরদিন সে বহুক্ষণ ধরে সাজলো। কিন্তু ভ্রূ আঁকতে গিয়ে মনটা বিদ্রোহী হয়ে উঠলো এটা সে কোন মতেই পারবে না। শুধু চোখের কোনে কাজল দিয়ে একটু টেনে দিল। প্রসাধন সেরে মা-কে ডাকলো সাধনা। দেখতো মা, চিনতে পারছো তোমার মেয়েকে ?

মেয়ের দিকে তাকিয়ে মায়ের অভিমান জল হয়ে গেল। বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, উনি বেঁচে থাকতে কেন একদিনও এমনটি সাজিস নি খুকী ? তাহলে কি তোকে চাকরির জন্যে আজ ঘুরে বেড়াতে হতো।

নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে নিতে সাধনা বললো, ছাড়ো ছাড়ো, সব নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর বিষণ্ণভাবে হাসলো,—বিয়ে না করেও চলে যাচ্ছে মা, কিন্তু চাকরি না হলে যে চলবে না। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেল সাধনার। বাবা কোনদিন জোর করেননি, কিন্তু সাজতে দেখলে মনে মনে খুশি হতেন। যখন একথাটা বুঝতে শিখেছিল সাধনা তখন আর প্রসাধনের পিছনে অর্থব্যয় করার সাধ্য ছিল না। বিনোদবাবু তখন নতুন যুগের নতুন কনট্রাক্টরদের সঙ্গে পাল্লা দিতে না পেরে পিছিয়ে আসছেন। একটার পর একটা লোকসান হচ্ছে। তৈরী বাড়ী ভেঙে নতুন ক'রে শুরু করতে হচ্ছে। পাঠানো মাল

খারাপ বলে ফেরৎ আসছে। নতুন কনট্রাকট পাচ্ছেন না। কারণ তিনি ইঞ্জিনিয়ার অফিসারদের ঘুষ খাওয়াতে রাজী হননি।

সাধনা যখন চাকরির ইন্টারভিউ দিতে বার হলো তখন পাড়ার সবাই খুব অবাক হয়ে গেল। হঠাৎ সাধনারা কি রাতারাতি বড়লোক হয়ে গেল? না কি চাকরি পেয়েছে মোটা একটা? অথবা—অন্য কোন পথ খুঁজে নিয়েছে?

বৃদ্ধ সুধন্যবাবু ভাবলেন, মেয়েটা তাহলে শয়তান! টাকা আছে অথচ ভাড়াটা দিচ্ছে না। আচ্ছা, ফেরো আজ, তারপর দেখাচ্ছি।

রামহরি দোকানে সওদা নিতে এসেছিল। ওর টেরা চোখটা সোজা হয়ে উঠলো, য়ঁ্যা? দিদিমণিকে নায়িকা নায়িকা লাগছে হে, জগো। তোমার দোকানের ধার এবার মিটবে মনে হচ্ছে।

জগো কাঁটা থেকে চোখ সরিয়ে এক পলক দেখে নিয়ে বললো, তাইতো হে। যাক্ বাবা। যে যা করে করুক, আমার টাকাটা পেলেই হলো, হ্যাঁ। আর তিনটি দিন দেখবো—তা-পর—এই যে ধরো, এক পঁচিশ।

রামহরির দৃষ্টিটা তখনো সাধনার শাড়ীর দিকেই নিবদ্ধ। বললো, তা যা বলেছ। আমরা আদার ব্যাপারী—

সাধনা তখন সামনে এসে পড়েছে সুতরাং চুপ করে গেল রামহরি।

সব কথা না শুনেও সাধনা বুঝতে পারে, ওর সাজসজ্জা নিয়েই একটা কিছু আলোচনা হচ্ছিল। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল সে।

টেস্ট আর ইন্টারভিউ একদিনেই। টাইপ টেস্টে ভালই হলো। লিখিত উত্তরগুলি মোটামুটি উৎরে যাবে কিন্তু ইন্টারভিউ দিয়ে বেরিয়ে এসেই সাধনা বুঝতে পারলো স্মার্ট ও মোটেই হতে পারে নি।

শেষ প্রশ্নটা ছিল: আপনি এ লাইনে আসতে চাইছেন কেন?

এখন মনে হচ্ছে উত্তরটা ওর হওয়া উচিত ছিল: এই লাইনে উন্নতি করতে পারবে বলেই আশা আছে ওর। সেই জন্যেই এসেছে। সে কথা বলা হয়নি। সত্য কথাটাই সে বলেছে, অন্য চাকরি না পেয়েই আসতে হয়েছে। চাকরি একটা ওর অত্যন্ত প্রয়োজন, যে কোন একটা চাকরি। নির্বাচনের কোন অবকাশ নেই।

তবু চাকরিটা সাধনাই পেল। পরে বিপিনবাবুর কাছে শুনেছে তাঁর জিদের ফলেই সাধনাকে নেওয়া হয়েছে। তিনি নাকি বলেছিলেন বেশী

কোয়ালিফায়েড সুন্দর চেহারার মেয়ে দিয়ে কাজ হয় না। হয় বিয়ে ক'রে সরে পড়বে, অথবা ছেলেগুলোর মাথা চিবিয়ে খাবে। নয়তো টিকবে না, অন্য চাকরীর চেষ্টা করবে। এমন টাইপিস্ট কেরাণী আমার চাই যে টিকে থাকবে, ভাল কাজ করবে, অর্থাৎ যার প্রয়োজন আছে চাকরির সবচেয়ে বেশী অথচ ছেড়ে দেবার পথ খুব সংকীর্ণ।

চাকরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুধন্যবাবু নোটিশ উঠিয়ে নিয়েছেন। জগো মুদীর দৃষ্টিতেও সম্ভ্রম এসেছে। আরো এক মাস স্বচ্ছন্দে সময় দিয়েছে দু জনেই।

নন্দিতার ধমকে আরো একপ্রস্থ শাড়ী ব্লাউজ কিনেছে সাধনা।

বেশ চলছিল বুড়ো অফিসার বিপিনবাবুর তত্ত্বাবধানে। হয়তো একটু স্নেহের চোখেই দেখতেন কর্তব্যপরায়ণ সাধনাকে। কিন্তু তার ফলেই সাধনা প্রমাদ গণলো একদিন। ছোট সাহেবের কী একটা কনফিডেন্সিয়াল জিনিস টাইপ করতে হবে। বিপিনবাবু ভাবলেন এই সুযোগে মেয়েটাকে সাহেবের নজরে এনে দিই।

সাধনাকে বলতে আতঙ্কিত হলো সে—আমি নতুন লোক। আমাকে দিচ্ছেন যদি ভুলচুক হয়?

বিপিনবাবু বললেন, কিচ্ছু ভয় নেই তোমার। আমি দেখে দেব এখন। সুযোগ যখন এসেছে ছোট সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়ে থাক। তোমারই ভাল হবে তাতে। অল্প বয়স হলেও ভালো লোক, তোমার কোন ভয় নেই।

দুরু দুরু বুকে চেম্বারে ঢুকলো সাধনা। কী একটা লিখছিলেন দত্ত সাহেব। মাথা না তুলেই ইশারায় বললেন, বসুন।

সাধনা ইতস্ততঃ ক'রে দাঁড়িয়েই রইল। মনে হল প্রথম আলাপে নমস্কার না করে বসাটা উচিত হবে না!

মিনিট দুয়েক পরে মাথা তুললেন দত্ত সাহেব। একি, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন।

হাত দুটো তুলে নমস্কার করতে গিয়ে যেন নিথর হয়ে গেল সাধনা। তার পর কোনমতে চেয়ারটায় বসে পড়ল। সামনে যে লোকটি বসে আছে সে রমাপতি। সেই রমাপতি—যাকে ও অপমান করেছিল একদিন। যাকে ও আর একটু অগ্রসর হলে, চড় মেরে বসতো হয়তো।

রমাপতি বললো, আমি শুনেছি আপনার কথা। আপনি তো নতুন এসেছেন, না? —কী হলো মিস গুপ্ত? শরীর খারাপ করছে নাকি?

না, কিছু হয়নি। ততক্ষণে সামলে নিয়েছে সাধনা। রমাপতি তা হলে চিনতে পারেনি। বললো, কী কাজ আছে বিপিনবাবু বলছিলেন?

রমাপতি যেন সে কথায় কান দিল না। সাধনা দেখলো রমাপতির দৃষ্টিতে যেন ধীরে ধীরে বিস্ময়ের রেখা ফুটে উঠছে। ঘামতে লাগল সাধনা, তবে কি চিনতে পেরেছে ওকে?

রমাপতি বলল, আচ্ছা আপনার পুরো নামটা কি বলুন তো।

নাঃ এখনো চেনেনি। হয়তো চিনবে না। হয়তো এটা স্বাভাবিক কৌতূহল। সপ্রতিভ হবার ক্ষীণ একটা আশায় সাধনা উত্তরটা এড়িয়ে গেল—কেন আমাকে কি আপনার চেনা-চেনা মনে হচ্ছে?

রমাপতি একটু হাসল। তারপর বলল, আপনি কি আমায় চিনতে পারেন নি, সাধনা দেবী?

বিবর্ণ হয়ে গেল সাধনা। মিথ্যাই সে চেষ্টা করছিল। অনেকক্ষণ আগেই রমাপতি চিনেছে ওকে। এবার? এবার কোথায় পালাবে সাধনা? আজ যদি রমাপতি সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নেয়? কিছুই করতে পারবে না সে। রমাপতি এখন সহপাঠী নয়, য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার। কী করবে সে? রেজিগনেশন দিয়ে চলে যাবে যদি রমাপতি অপমান করে?

না, চাকরি সে কিছুতেই হারাতে পারবে না। চাকরি হারালে বাইরে তার চেয়েও বেশী অপমানের ভয়। শুধু অপমান কেন? বেঁচে থাকার প্রশ্ন।

রমাপতি অপমান করলেও আজ সহ্য করতে হবে তাকে মাথা নীচু করে। রমাপতি ওর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা।

যথাসাধ্য স্বাভাবিক স্বরেই সাধনা বললো, চিনতে পারবো না কেন? আমি তো আপনার মত বড় চাকরি না। ভাবছিলাম, আপনাকে চিনি বলাটা ঔদ্ধত্য হবে কিনা।

—আপনি দেখছি আগের মতই কঠিন কঠিন কথা বলতে পারেন। তবুও বলব, আপনাকে দেখে আমি অবাক হয়েছি বৈকি।

ধীরে ধীরে সাহস ফিরে আসছে সাধনার। রমাপতিকে দেখে মনে হচ্ছে ভয় করার মত কিছু নেই। তরল স্বরে বলল, কেন খুব বদলে গেছি নাকি?

রমাপতি বলল, বদলেছেন বৈকি। আমরা দু জনেই কিছুটা বদলেছি

নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি এই সামান্য কেরাণীর চাকরি করতে এলেন কেন কিছুতেই ভেবে পাচ্ছি না।

সাধনার মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো। রমাপতি কী আবার কলেজ জীবনের মত বিদ্রূপ শুরু করলো ? না, রমাপতির চোখে কিন্তু বিদ্রূপের আভাস নেই। সহজ স্বরে বলল, কেন এতে অবাক হবার কী আছে ? অনেক মেয়েই তো চাকরি করে—

—করে, তবে—দাঁড়ান। কী খাবেন বলুন, চা না কফি ?

সাধনা যেন হঠাৎ সহৃদয় উচ্ছল সহপাঠিনী হয়ে উঠল। যেন রমাপতির সঙ্গে ওয়াই. এম. সি. এ-তে গল্প করতে এসেছে এমনি সুরে বলল, যা হয় বলুন না ?

বেয়ারা বেরিয়ে যেতে পরিহাসের সুরে সাধনা বলল, নিম্নতম কেরাণীকে এ. জি. এম. কফি খাওয়ালে বদনাম হবে না ?

—না। ওটা আমার অভ্যাস আছে। আমার ঘরে যার কাজ পড়ে তাকে কফি খাওয়াই আমি। হ্যাঁ, দাঁড়ান, যে কাজের জন্য ডেকেছিলাম আপনাকে। মনে হচ্ছে বিপিনবাবুকে খুব হাত করেছেন। একজন ইনটেলিজেণ্ট টাইপিস্ট চেয়েছিলাম, তাতে আপনার নামই সাজেস্ট করলেন।

একটা ফাইল দিয়ে বুঝিয়ে দিল রমাপতি কোন্ কোন্ অংশ কী ভাবে টাইপ করতে হবে।

ইতিমধ্যে কফি এসে গেল। কিন্তু অন্য কোন কথা হল না। একটা ফোন পেয়ে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেল রমাপতি। বলল, সময় মত যদি ফিরি তবে কথা হবে। টাইপের কাজটা কাল সকালে দিলেই হবে।

নিজের সীটে ফিরে এসে সাধনার মনে হল প্রথম পরীক্ষাটায় সে ভালভাবেই উত্তীর্ণ হয়েছে। কে ভাবতে পেরেছিল কলেজের সেই নিরীহ অতি-সাধারণ রমাপতি আজ এত বড় অফিসের য়্যাসিস্টাণ্ট জেনারেল ম্যানেজার হয়ে বসবে, আর তার অধীনে নিম্নতম কেরাণীর কাজ করতে হবে বিনোদ গুপ্তের একমাত্র মেয়ে সাধনাকে ?

কলেজ জীবনে আশেপাশে ঘোরাফেরা করত। অযাচিতভাবে কাছে আসার, কথা বলার সুযোগ খুঁজত, অনুসরণ করত রমাপতি। অসহ্য লাগায় একদিন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে শুধিয়েছিল সাধনা, আপনি আমার পিছু নিয়েছেন

কেন বলুন তো ? কী চান্ আপনি ?

ওর দৃপ্ত ভঙ্গীর সামনে রমাপতি এতটুকু হয়ে গিয়েছিল। আমতা আমতা করে বলেছিল, তোমাকে আমার ভাল লাগে সাধনা।

—আমাকে ভাল লাগে? চিবিয়ে চিবিয়ে কথাটা উচ্চারণ করেছিল সাধনা। তারপর ক্রুদ্ধস্বরে বলেছিল, আর কত জনকে এ কথাটা বলেছেন ?

—কী বলছ তুমি ? আমি—

কণ্ঠে বিষ ঢেলে সাধনা বলেছিল, আমাকে 'তুমি' বলবার অধিকার কে দিয়েছে আপনাকে ? ঘনিষ্ঠতা করার চেষ্টা করে লাভ হবে না, সে কথা বলে দিলাম আপনাকে। আমাকে ভাল লাগে ! ভাল লাগার মত চেহারা আমার নয়, সে আমি জানি রমাপতিবাবু। মিথ্যে প্রশংসা শুনে গলে যাবার মত মেয়ে আমি নই। মনে রাখবেন, আবার যদি কোন দিন এসব ন্যাকামি করতে আসেন তবে রিপোর্ট করব আপনার নামে।

রমাপতি একটু সাবধান হয়েছিল তারপর থেকে, কিন্তু তবুও লক্ষ্য করেছে সাধনা তার চোখ দুটো ওকে অনুসরণ করেছে মাঝে মাঝে। তবে এগিয়ে আসার আর সাহস হয়নি রমাপতির।

আজ কি ভদ্র ব্যবহারের ছলে প্রতিশোধ নিচ্ছে সেদিনের অপমানের ? উপভোগ করছে সাধনার মর্মযন্ত্রণা ?

করুক। সাধনা সেদিনের কথা ভুলে যাবে। কোন মতেই সে রমাপতিকে চটাতে পারবে না। বরং হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে তাকে খুশী রাখার চেষ্টাই করবে। অপমান করলেও সহ্য করতে হবে। হাসিমুখে উড়িয়ে দেবে বিদ্রূপের ঝলসানি।

পরের দিন কাজটা ফেরৎ দিতে গিয়ে সাধনা শুনলো ছোট সাহেব আজ অফিসে এসেই বেরিয়ে গেছেন, হয়তো বিকালে ফিরবেন অথবা না-ও ফিরতে পারেন। মনে মনে খুশি হলো সাধনা আর একটা দিন কেটে গেল। কিন্তু ছুটির পর গেটের সামনে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল।

রমাপতি গাড়ী থেকে নামছে। দেখতে পেয়ে হেসে বললো, বাড়ী যাচ্ছেন ?

—হ্যাঁ, আপনার কাজটা কিন্তু হয়ে গেছে আমার।

রমাপতি বললো, হয়ে গেছে ? যদি আপনার তাড়াতাড়ি না থাকে—

ইতস্তত করে সাধনা বলল,—না, এমন কিছু নয়।

—তা হলে একটু আমার ঘরে যদি আসেন। বেশী দেরী হবে না। পৌছে দেব আপনাকে। আসুন না।

হলে ঢুকে রিপোর্টটা আনতে যাচ্ছিল সাধনা। রমাপতি বললো, থাক না আজ। অফিস টাইম ত শেষ হয়ে গেছে। আসুন না, একটা কাজ সেরে নিয়েই বেরিয়ে পড়ব। কাল তো কথা বলতেই পারলাম না।

অফিসটা প্রায় ফাঁকা হয়ে গেছে। সাধনা একটু ভয় পেল। রমাপতির অন্য কোন মতলব নেই ত? সুপুরুষ সুপ্রতিষ্ঠিত রমাপতি যদি আজ একা পেয়ে অপমান করে বসে? যদি রমাপতি—

সাধনা একটু থমকে গিয়েছিল চেম্বারের সামনে এসে। তাকিয়ে দেখছিল, আশেপাশে আর কে কে আছে। রমাপতি দরজা খুলে ডাকলো, আসুন।

সাধনা দ্বিধাগ্রস্তভাবে বসল চেয়ারে। রমাপতি যেন কয়েক মুহূর্ত ভুলে গেল ওর কথা। একটা টেলিগ্রাম লিখে বেয়ারাকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে বললো। তার পর একটা ফোন করলো কাকে, হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। এক্ষুণি আমি টেলিগ্রাম করলাম বম্বেতে।

কাজ শেষ করে সাধনাকে বললো, ব্যাস। চলুন বেরিয়ে পড়া যাক।

গাড়ীতে বসে রমাপতি বলল, আপনার দেরী হয়ে গেল বোধ হয়। বলুন, কোনদিকে থাকেন আপনি। পৌছে দিই।

সাধনার মনের মেঘ কেটে গেছে। বললো, বাড়ী পৌছে দেবার জন্যেই এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছিলেন নাকি?

—না। ভেবেছিলাম গল্প করবো একটু। কিন্তু অফিসে বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। তা ছাড়া আমি থাকা মানেই আরো তিনটে লোক আটকে থাকবে।

সাধনা শুধালো, আপনি কোথায় যাবেন?

—বাড়ী ফেরার তাড়া নেই। ঘুরবো একটু।

—কেন বাড়ীতে কেউ নেই? মানে, আপনার স্ত্রী?

হেসে উঠলো রমাপতি, সে সৌভাগ্য এখনো হয়নি। বলুন কোনদিকে যাব।

সাধনা বলে বসল যে দিকে খুশি চলুন। আমারও তাড়া নেই।

—তা হলে চলুন, কোথাও গিয়ে বসা যাক্।

গাড়ী ছুটলো দক্ষিণে, তার পর বাঁ দিকে। পার্ক ষ্ট্রীট।

সাধনা একবার চমকে উঠলো, একি করছে সে? রমাপতির হাতে যেন

নিজেকে তুলে দিচ্ছে।

রমাপতি আবার কথা বলল, কী চুপ করে রইলেন যে। বিয়ে করিনি শুনে ঘাবড়ে গেলেন ?

সাধনা বলল, কিন্তু করেনই বা কেন ?

—আপনিও তো করেননি। সেটাই বরং অস্বাভাবিক।

—কেন ? আমি মেয়ে বলে ?

—নিশ্চয়ই। আপনার মত বয়সে ক'জন মেয়ে অবিবাহিত দেখা যায় ? এসব কথা থাক্। আপনি কিন্তু এই চাকরি করতে এলেন কেন তা তো বললেন না।

হঠাৎ একটা হোঁচট খেল সাধনা। স্বচ্ছন্দ চিন্তায় গতিটা ব্যাহত হল চাকরির কথায়। মনে হলো, রমাপতি বোধ হয় ইঙ্গিতে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে ওরা সহপাঠী নয়। আজ ওরা সমান নয়। রমাপতি বড় অফিসার আর সে নিম্নতম কেরাণীমাত্র। হয়তো সে বলতে চাইছে, কেমন ? সেদিন আমায় অপমান করেছিলে দম্ভভরে, আর আজ আমার হাতের মুঠোয় তুমি।

তিক্তকণ্ঠে বললো, আপনি কি আমায় বিদ্রূপ করছেন রমাপতিবাবু ?

অবাক হয়ে রমাপতি তাকাল ওর দিকে। তারপর বলল, কলেজেও একদিন আপনি এই ধরনের একটা কথা বলেছিলেন, আপনার হয়তো মনে নেই। সেদিন আপনি এত রেগেছিলেন যে আমি উত্তর দিতে পারিনি। আজ যখন সুযোগ পেয়েছি তখন বলি, আপনাকে বিদ্রূপ করার জন্য কিছু বলিনি। সেদিনও নয়, আজও নয়। আপনার মনে আঘাত দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। যতদূর জানতাম আপনার বাবার অবস্থা ভালই ছিল. তা ছাড়া লেখাপড়াও শিখেছেন। এই চাকরি কেন করতে আসতে হয়েছে আপনাকে, এ কৌতূহলটা কি একেবারেই অশোভন ?

রমাপতির স্বরে বিদ্রূপের ইঙ্গিত নেই বরং বেদনার আভাস। লজ্জিত হলো সাধনা। মনে পড়লো রমাপতি সত্যিই কোনদিন অসঙ্গত আচরণ করেনি। অপমানের উত্তরেও কোনদিন অসংযত হয়নি।

চোখ তুলে বলল, ক্ষমা করবেন। বাবা মারা যাওয়ার পরে সব কিছু গেছে আমাদের। ছ'বছর ধরে যে কোন একটা চাকরি খুঁজে খুঁজে এমন হয়রান হয়ে গেছি যে আপনার প্রশ্নটা বিদ্রূপ বলেই মনে হয়েছিল। আপনি বিশ্বাস

করুন এ চাকরিটা না পেলে আমাকে খুব বিপদে পড়তে হতো।

কেউ কোন কথা বলল না আর। গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো একটা বিখ্যাত রেস্টুরেন্টের সামনে।

মৃদু আলো আর চড়া জ্যাজের অন্তরালে রমাপতি অতীত দিনগুলির মধ্যে ডুবে গেল।

একদিন এই প্রসাধনহীন মেয়েটিকে ভাল লেগেছিল ওর। নিরাভরণ এই দৃপ্ত সহপাঠিনীটি কী এক দুর্বোধ্য কারণে আকর্ষণ করতো ওকে। তখন বোধ হয় নিজেও জানতো না কেন অপমানিত হওয়ার পরেও এই শ্যামলী মেয়েটির কাছে আসতে চাইতো সে। তীক্ষ্ণ বিদ্রূপে ঝলসে উঠতো সাধনা। আজ সব কিছু বদলে গেছে, তবু এই মুহূর্তে যেন মনে হলো সেই দৃপ্ত রেশটুকু শেষ হয়ে যায়নি।

এখন বুঝতে পারছে রমাপতি, সাধনা ওর নিজের মায়ের কথা মনে করিয়ে দিত। মা-ও ছিলো এমনি দৃপ্ত ব্যক্তিত্বে অপরূপা। প্রসাধনের সাহায্যে সুন্দরী সাজতে প্রবল আপত্তি ছিল তার। এবং এই নিয়েই বাবার সঙ্গে মতান্তরটা শুরু হয়।

শ্বশুরের সাহায্যে সমাজের উর্ধ্ব স্তরে ওঠার পর চিন্তাধারণা বদলাচ্ছিল বাবার। তিনি চেয়েছিলেন ওঁর স্ত্রীর রূপের অভাবটা প্রসাধনে বেশভূষায় ঢেকে দিতে। বিশেষ করে পার্টিতে যেতে হলে পীড়াপীড়ি করতেন, ভাল করে সাজো। গহনাগুলো পড়ো। জান তো, সেখানে কারা আসবে সব।

মা বলতেন, না। আমি যা তাই। রঙ মেখে বেশভূষার জোরে আমি রূপসী হতে চাই না। যেতে হয় এমনি যাব নয়তো যাব না।

ফিরে এসে রাগারাগি হতো। তার পর মা যাওয়া বন্ধ করলেন। ক্রমশঃ বাইরের টান বাড়লো বাবার। এবং নানা কথা শোনা যেতে লাগল। তার পর মা একদিন রমাপতিকে নিয়ে চলে এলেন সে বাড়ী ছেড়ে বাবার কাছে।

সেই থেকে প্রসাধনের কৃত্রিম সৌন্দর্য অসহ্য লাগে রমাপতির।

রমাপতি তাকিয়ে দেখলো সাধনার দিকে। কোথায় গেল ওর সেই নিরাভরণ সহজ কমনীয়তাটুকু ?

ওর ব্যথিত দৃষ্টিটা নেমে এলো সাধনার চূর্ণকুন্তলের পাশে, যেখানে কটুশুভ্র

পাউডারের প্রলেপটা হঠাৎ শেষ হয়ে যাওয়ার আশংকায় উগ্র হয়ে উঠেছে, তার পর গ্রীবাদেশে, যেখানে শ্যামল ত্বকের গভীরে ঘন শুভ্র রেখাটা কুৎসিৎ অট্টহাসিতে প্রখর। তারো নীচে কাঁধের ওপর—আসমানী শাড়ীর অন্তরালে গাঢ় লাল ব্লাউজের আভাস যেখানে বিসদৃশভাবে পরিস্ফুট।

চোখ ফিরিয়ে নিল রমাপতি। সাধারণ হয়ে গেছে সাধনাও।

যেন স্বগতোক্তি করল সে।—এমনি করে তুমি নিজেকে নিঃস্ব করে দিলে, সাধনা!

চমকে উঠে রমাপতির দিকে তাকালো সাধনা। কী বলছে রমাপতি? কী বলতে চায়?

কিন্তু রমাপতি আর কিছু বললো না। ওর দৃষ্টি তখন অন্য টেবিলগুলোর ওপর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সাধনা দেখলো কী একটা যন্ত্রণা যেন ওর ব্যথিত চোখে ফুটে উঠেছে। মুখোমুখি তাকালো সে রমাপতির দিকে। রমাপতিও চোখে চোখ রাখলো। সে চোখে যেন একটু বিস্মিত আনন্দ হঠাৎ ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে নিল সাধনা।

সেদিন কিছু বলেনি রমাপতি। কিন্তু সাধনা জানতে পেরেছে কেন সে এ কথা বলেছিল, কেন ওর দৃষ্টি ব্যথিত হয়ে উঠেছিল সুসজ্জিতা হাস্যোচ্ছল তরুণীদের দিকে তাকিয়ে। আর তার পর ওর চোখের দিকে তাকিয়ে কেনই বা সে স্বস্তিবোধ করেছিল। সাধনা জেনেছে ওর অসুন্দর প্রসাধনহীন দৃপ্ত শ্রীই আকর্ষণ করেছিল রমাপতিকে। খুশী হয়েছিল ওর ভ্রূতে পেন্সিলের দাগ নেই বলে। প্লাক করেনি সে।

রমাপতি ঘৃণা করে উগ্র প্রসাধনকে। কেন করে সে কথাও জেনেছে বৈকি সাধনা।

সব কথা জানার পরেও কিন্তু সাধনা সাজে, সাধারণ প্রসাধন করে, ঝল-মলে শাড়ী ব্লাউজ পরে। কিন্তু চাকরির ভয়ে নয়। ও জানে রমাপতি থাকতে চাকরি ওর যাবে না।

সাধনার মনে হয়েছে আজ যদি হঠাৎ আবার আগের দিনে ফিরে যায়, ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়, তবে রমাপতির চোখে ছোট হয়ে যাবে সে। রমাপতি ভাববে, সাধনা ওকে খুশি করার জন্যই প্রসাধন ছেড়েছে। কোনমতেই বিশ্বাস করবে না, ধার-করা সৌন্দর্যকে সে আন্তরিকভাবেই ঘৃণা করে।

উত্তরায়ণ

গত দুবছরের কথা মনে পড়ছে।

সেদিনটা ছিল রবিবার। ঘরে পা দিয়েই শুভ্রা থমকে গেল। আমরা সবাই সচকিত হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। অস্ফুট কণ্ঠে বললাম, তুমি? এমন সময়ে হঠাৎ? চিনলে কি করে?

শুভ্রাও অপ্রস্তুত হয়েছিল। মুখে যা এসে গেল তাই বলে কৈফিয়ৎ দিল —এদিকে এসেছিলাম, তাই ভাবলাম খবর নিয়ে যাই।

কথাটা যে বানানো সেটা বুঝতে কারো অসুবিধা হ'লো না। এবং তাতে সবাই আরো অপ্রস্তুত হলো।

বললাম, দাঁড়িয়ে রইলে যে? বোসো, আলাপ করিয়ে দিই। অমর, ইন্দ্রজিৎ, সজল আর মনোতোষ। আর ইনি শুভ্রা ব্যানার্জী। নমস্কার বিনিময় হলো, কিন্তু অস্বস্তির ভাবটা কাটলো না। সজলকে সবচেয়ে বেশী সন্ত্রস্ত মনে হলো। সেই বললো, আমরা চিনি ওঁকে।

শুভ্রা একটু হাসলো। তারপর আমার দিকে তাকালো। আমি বিব্রত হয়ে চেয়ারটা টেনে আবার বললাম, বোসো।

অবস্থাটা বুঝতে পেরে ইন্দ্রজিৎ বললো, আমরা তাহলে চলি, ভবেশ। বিকালে পারলে আসিস।

আমি কিছু বলার আগেই ওরা পালিয়ে বাঁচলো। সামাজিক ভদ্রতার মুখোসটা খুলে ফেলে শুভ্রা এবার মুখোমুখি হলো আমার।—এখানে জোর আড্ডা জমেছে দেখছি। কী হচ্ছিল শুনি।

কাগজপত্রগুলো একপাশে চাপা দিয়ে সহজ হবার চেষ্টা করে বললাম, তুমি যে রণরঙ্গিনী হয়ে এসেছ। বোসো তো আগে।

বসল শুভ্রা। তারপর বলল, বলো এবার কী করছিলে লুকিয়ে লুকিয়ে। বুধবার থেকে পাত্তা নেই কেন?

কৈফিয়তের সুরে বললাম, মানে খুব ব্যস্ত ছিলাম ক'দিন। তুমি একটু বোসো, আমি চায়ের জন্য বলে আসি।

ঝাঁঝিয়ে উঠল শুভ্রা।—থামো, আপ্যায়ন দেখাতে হবে না। চা খেতে তোমার এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে আসিনি। উঃ এইখানে মানুষ থাকে? আর ঘরেরই বা কী বাহার। কেন চাকরী-বাকরী তো করছ। কাছেপিঠে একটা ভাল বাসা যোগাড় করতে পার না?

অন্যদিন হলে ঠাণ্ডা করতাম। সেদিন পারলাম না। মনটা অস্থির সন্ত্রস্ত ছিল। বললাম, সত্যি পাচ্ছি না। ব্যাচিলরকে কে ঘর দেবে বলো। ওসব কথা থাক, এতদূর এই রোদ্দুরে কী ব্যাপার? তখন যে মিথ্যা কথা বলেছ, সে তো বুঝতেই পারছি। কী ব্যাপার বলোতো।

—ব্যাপারটা কী সেটা শুনবো বলেই তো এলাম। তোমরা নাকি ষ্ট্রাইক করছ?

জানতাম ধরা পড়ব। তবু এত শীগ্রি, সেটা বুঝতে পারিনি। আমতা আমতা করে বললাম, এখনো ঠিক হয়নি।

—অর্থাৎ কথা চলছে? গম্ভীর হয়ে উঠলো শুভ্রার মুখ। তারপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গতিক্তস্বরে বললো, তুমি বোধ হয় একজন পাণ্ডা, তাই না? অস্বীকার কোরো না। আমি বুঝতে পেরেছি, কিছু একটা গোপনীয় ব্যাপারে যেতে ছিলে। নইলে তোমরা সবাই অমন করে চমকে উঠতে না। তা ছাড়া তোমার চাপা দেওয়ার আগেই মেমোরেণ্ডামের ঠিকানাটা আমি দেখে ফেলেছি।

বললাম, এ ছাড়া উপায় নেই শুভ্রা। তুমিও একদিন রাজনীতি করেছ, তোমার বোঝা উচিত এরকম অবস্থায়—

বাধা দিয়ে শুভ্রা বললো, অবস্থাটা আমি বাবার কাছে শুনেছি, ভবেশ। চুরিটা যে ওপরের মহলে তা প্রায় প্রমাণ হয়ে যাওয়ার পরেও যে পাঁচজন কেরাণীর এই অপবাদে চাকরী গিয়েছে তাদের কেন পুনর্বহাল করা হবে না এই নিয়েই তো ব্যাপারটা, তাই না? তোমরা দাবী করছ মনোজবাবুর চাকরী যাক, আর এই পাঁচজনকে নেওয়া হোক, এই তো?

আমতা আমতা করে বললাম—তুমি তো সবই জানো দেখছি।

—হ্যাঁ, জানতে হয়েছে। বাবাকে শুধিয়েছিলাম তোমার কথা। তিনিই বললেন, তুমি বোধহয় ইচ্ছে করেই যাচ্ছ না। হয়তো আর যাবেও না আমাদের বাড়ী। যাক, তুমি যে পথে পা বাড়াচ্ছ তার পরিণতি কী জানো?

—জানি, চাকরী যেতে পারে।

—হ্যাঁ, শুধু তোমার নয়; আরো একশ পঞ্চাশ জনের। অফিসটাই উঠে

যাবে হয়তো।

বললাম, হয়তো কারোর চাকরীই যাবে না, আমরা জিতব।

—তা হলে বাবার চাকরী যাবে। তা নয় গেল। কিন্তু, যদি না জেত ?

—ছেড়ে যেতে হয় যাব, তবু এ অন্যায় সহ্য করা যায় না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো শুভ্রার। তারপর বলল, ব্যাপারটা আমিও সব জানি না, ভবেশ। তবে এইটুকু মনে হচ্ছে, মনোজবাবুকে যদি যেতে হয় তবে বাবাকেও যেতে হবে। তুমি জানো না ভবেশ বাবা কী রকম জড়িয়ে পড়েছেন।

জানতাম, ষ্ট্রাইক করার মানে হিমাদ্রিবাবুর বিরোধিতা করা। অথচ আমাকে উনিই চাকরীটা দিয়েছিলেন। তার জন্য ওঁকে অবশ্য অনেক বেগ পেতে হয়েছিল। বলেছিলেন, দেখো তোমাদের ছাত্রজীবনের পাগলামি যেন এখানে করো না। স্বীকার করেছিলাম, গোলমাল কিছু করব না। আমি ষ্ট্রাইকারদের দলে ভিড়লে ওঁর মুখ থাকবে না। কিন্তু উনি ছোট কোন কাজ করবেন ভাবতে পারিনি। বিস্মিত হয়ে বললাম, তার মানে হিমুকাকাও চুরি করেছেন ?

—বাবা চুরি করেছেন! কী বলছ তুমি, ভবেশ ? শুভ্রা উঠে দাঁড়াল উত্তেজিতভাবে। —বাবাকে তুমি চেনো না ? বাবার সততায় সন্দেহ করছ ?

বললাম, বোসো বোসো। কাকাবাবুকে আমি কম শ্রদ্ধা করিনা শুভ্রা। এই জন্য ছু-দুবার চাকরী ছেড়েছেন সে কি জানি না। সেই জন্যই তো অবাক হচ্ছি তোমার কথায় ? উনি কী করে জড়িয়ে পড়লেন ?

খানিকটা শান্ত হলো শুভ্রা। ক্লান্তকণ্ঠে বললো, তা আমি জানি না, ভবেশ। তোমার কাছে আমি অনুরোধ করছি। এ নিয়ে গোলমাল করো না। তাতে তোমাদের অথবা বাবার ভীষণ ক্ষতি হবে।

বন্ধুদের কাছে কথা দিয়েছি। ব্যাপারটাও খুব গুরুতর, নীতিগত প্রশ্ন আছে। তা ছাড়া মনোজবাবুকে কেউ পছন্দ করে না। আমার কথা কেউ শুনবেও না। আর, সবার বিরুদ্ধে কী করে যাব আমি ?

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম, তা হয় না শুভ্রা। তোমার বাবাকে বা নিজেকে বাঁচাবার জন্য অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

—দোষ না থাকলেও শাস্তি পেতে হবে বাবাকে ? শুভ্রা ওর আয়ত চোখ তুলে অসহায়ের মত চাইলো আমার দিকে।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। বললাম, দোষ না থাকলে জড়াবেন কেন?

—তাঁকে যে তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে ভবেশ, বুঝতে পারছো না। হয়তো ওঁকে স্কেপগোট করা হচ্ছে।

বললাম, উপায় নেই, শুভ্রা। কোন উপায় নেই।

শেষ বারের মত শুভ্রা উঠে দাঁড়াল। বললে, আমার জন্যেও পার না?

বললাম, অন্যায় অনুরোধ কোরো না শুভ্রা। তাতে আমি নিজের কাছে, তোমার কাছেও ছোট হয়ে যাব।

শুভ্রা আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে গেল। আমি কোন বাধা দিতে পারলাম না।

তারপর থেকে ওর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল। স্ট্রাইক চলার সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততার সৃষ্টি হলো। বিষিয়ে উঠল মনটা। হিমাদ্রিবাবুকে ঘৃণা করতে শুরু করলাম—শুভ্রাও মুছে গেল।

স্ট্রাইক হলো শেষ পর্যন্ত। কর্তৃপক্ষের হয়ে কথা চালালেন হিমাদ্রিবাবুই। সহকর্মীরা জানতো আমার অবস্থার কথা, তাই প্রতিনিধি দলে দেয়নি। ইউনিয়ন ম্যানেজিং ডিরেকটারের সঙ্গে দেখা করতে চাইল। দেখা হল না। হিমাদ্রিবাবুই দিলেন না। ডিরেকটাররা সমস্ত ক্ষমতা তাঁর ওপর দিয়েছেন। হিমাদ্রিবাবুর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো সবাই যেদিন অফিসের দরজায় পুলিশ বসলো। কোম্পানীর গাড়ীতে পুলিশ বসিয়ে যাতায়াত করতে লাগলেন হিমাদ্রি-বাবু। নানা রকম চেষ্টা চললো স্ট্রাইক ভাঙার। কিন্তু ভাঙলো না। মনোজবাবুর অপসারণ ও বরখাস্ত কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগের সঙ্গে পিওন বেয়ারা ও নীচের স্তরের কেরাণীদের মাইনে বাড়াবার দাবী জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অফিসের সামনে পিকেটিং করার সময় হিমাদ্রিবাবুকে আসতে যেতে দেখতাম অন্য অফিসারদের সঙ্গে। আমিও ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিতাম 'ডাউন উইথ হিমাদ্রি ব্যানার্জী।'

বলতে আমার বাধতো না, কারণ আমরা শুনেছিলাম, মনোজবাবুর চুরির টাকার একটা পার্সেণ্টেজ হিমাদ্রিবাবুও পেয়েছিলেন। মুখোমুখি পড়লে আমি বলতে পারতাম, আপনি না একদিন বিপ্লবী ছিলেন?

মাস দেড়েক পরে ম্যানেজিং ডিরেকটার ডেকে পাঠালেন।

তখন য়্যাকাউন্ট্যান্ট মনোজবাবুর চেয়ে সেলস্ ম্যানেজার হিমাদ্রি ব্যানার্জীর ওপর আক্রোশ বেশী সকলের। আমরা প্রথমে হিমাদ্রিবাবুর নামও যুক্ত করেছিলাম, শেষে রফা হলো কারোরই চাকরী যাবে না। বরখাস্ত পাঁচজনকে আবার নেওয়া হবে, আর মাইনে কিছু বাড়ানো হবে নীচের দিকে এবং বাইরে থেকে লোক না এনে প্রোমোশন দেওয়া হবে এবার থেকে।

প্রোমোশন যারা পেল তাদের মধ্যে আমি আর সজলও ছিলাম। প্রথমে সবাই একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলো : আমি কি ভিতরে ভিতরে যোগ রেখে-ছিলাম হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে ? সজল পুরোণো লোক, ওর প্রোমোশন প্রাপ্য ছিল অনেকদিন। সেই বাঁচালো আমাকে। বলল, বাঃ ভবেশের কোয়ালি-ফিকেশন, এফিসিয়েন্সি এসব নিয়ে আমরাই চাপ দিয়েছিলাম। দেখছিস্ না স্বয়ং এম. ডি.র সই। ম্যানেজারের ক্ষমতা এবার কেড়ে নেওয়া হবে আস্তে আস্তে। সবুর কর একটু। সরালো না নেহাৎ কোম্পানীর প্রেষ্টিজ আর ডিসিপ্লিনের জন্যে। হাজার হোক একটা ম্যানেজার তো। দেখ এবার কী হয় আস্তে আস্তে। এমনি ছেড়ে দেবে ভেবেছিস ?

সত্যিই আস্তে আস্তে অনেক ঘটনা ঘটলো তারপর। আমার পোষ্টিং হলো দিল্লীর ছোট অফিসটায়। হিমাদ্রিবাবুর সঙ্গে আর দেখা হবে না, মুখোমুখি হতে হবে না। শুভ্রার কথা মনে হয়েছিল বৈকি। কিন্তু আর দেখা করতে যেতে পারিনি। যদি শুভ্রা বলতো, প্রোমোশনের খবর নিয়ে বাড়ী বয়ে অপমান করতে এসেছ বাবাকে ?

প্রোমোশন পাওয়ার পর অপদস্থ হিমাদ্রিবাবুর বাড়ী যেতে বিবেকেও বেধেছিল। যতই হোক বাবার ছোট বেলার বন্ধু হিমাদ্রিবাবু চাকরীটা না দিলে আজ কোথায় থাকতাম, কী করতাম কে জানে।

তারপর একদিন দিল্লীতে বসেই শুনলাম আরো একটি প্রোমোশন পেয়েছে সজল। বটকৃষ্ণবাবু রিটায়ার করেছেন। তাঁর জায়গায় সেলসের য়্যাসিষ্টেন্ট ম্যানেজার হয়েছে। কনগ্রাচুলেট ক'রে চিঠি দেওয়ার পর যে উত্তর পেলাম তাতে জানলাম আরো অনেক পরিবর্তন হবে শীগ্গি। সজল লিখেছিল : মনোজবাবু আর হিমাদ্রিবাবুর মধ্যে প্রচণ্ড গোলমাল বেধেছে। কী হবে বলা যায় না। তবে একটা কিছু হবে ঠিকই।

এর পরের ঘটনায় আরো অবাক হয়ে গেলাম। এতদিন জেনারেল

ম্যানেজারের পোস্ট ছিল না অফিসে। হিমাদ্রিবাবুকেই ম্যানেজার করা হয়েছে। খবরটা অফিস সার্কুলারেই পেলাম। হঠাৎ মনে হলো প্রভুভক্তির পুরস্কার পেয়েছেন ভদ্রলোক। হাসলাম, এই লোকটিকে একদিন শ্রদ্ধা করতাম আমি।

সজলের ব্যক্তিগত চিঠি এলো : তুমি যদি আজ শুভ্রাদেবীর সঙ্গে যোগাযোগটা রাখতে তবে এখানে লায়াজঁ অফিসার হয়ে চলে আসতে পারতে অনায়াসে। একটা নতুন পোষ্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে। এখানে বসে দিল্লী বম্বে আর কুলটির ওপর তদারকির কাজ। মোটা মাইনে। তাছাড়া গাড়ী দেবে, এয়ারকণ্ডিশন্‌ড ক্লাসে টুর। বুড়োরা সব রিটায়ার করছে। তোমার আমারই ত যুগ। তোমার মত ইকনমিক্‌সে ফার্ষ্ট ক্লাস হলে চেষ্টা করতাম—তা ছাড়া আমার তো কনেকশন্‌ও তেমন নেই। কথাটা লিখলাম তোমাকে, ভেবে দেখো।

শুভ্রার সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে অর্থাৎ যে হিমাদ্রিবাবুকে ঘৃণা করি তাঁর কাছে আবার অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে যেতে কি করে পরামর্শ দিল সজলটা। চিঠিটা কুটি কুটি ছিঁড়ে ফেললাম। কোন জবাব দিলাম না।

এর পরের ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটে গেল যে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। ক'দিন ধরে অফিসের চিঠিপত্র ঠিকমত পাচ্ছিলাম না। অর্ডার ঠিকমত সাপ্লাই হচ্ছিল না। দু'খানা টেলিগ্রাম করেও উত্তর পেলাম না। শেষে ট্রাঙ্ক কল করলাম সজলকে। অফিসে নেই। বললাম, সেল্‌স ম্যানেজারকে দিন। অতীনবাবু বললেন, একটু গোলমাল যাচ্ছে। ব্যস্ত হবেন না। দিন দশেক পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন জরুরী মিটিং আছে, পরে সব জানতে পারবেন।

কিছুই জানতে পারলাম না। সজলের বাড়ীর ঠিকানায় চিঠি দিলাম। জবাব এলো সংক্ষিপ্ত : হিমাদ্রিবাবু ছুটি নিয়ে বসে আছেন, ভীষণ গোলমাল চলছে। কুলটিতে স্ট্রাইক হয়েছে। এখানে কি হয় বলা যায় না। খুব সাবধানে থেকো।

অমরের ঠিকানা জানতাম না। ইন্দ্রজিৎ অন্য অফিসে চলে গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত মনোতোষকে চিঠি দিলাম। ঘনিষ্ঠতা ছিল না তেমন, তবু সহকর্মী হিসেবে পরিচয় হয়েছিল গত স্ট্রাইকের সময়।

মনোতোষ লিখল : কুলটির কারখানায় পঞ্চাশ জনকে ছাঁটাই করায় স্ট্রাইক হয়েছে। তা ছাড়া বোধ হয় জি. এম্‌-এর সঙ্গে ডাইরেক্টারদের মতদ্বৈধ হয়েছে

অফিসে আসছেন না অথবা আসতে দেওয়া হচ্ছে না। মনোজবাবুই এখন জি. এম্-এর কাজ করছেন। হিমাদ্রিবাবুর বদলে উনি আর ডিরেক্টার নিজে এবার কুলটি গিয়েছিলেন তারপরই এই ব্যাপার। হিমাদ্রিবাবুকে নাকি কুলটি যেতে বলা হয়েছিল, উনি যাননি। এখন আবার শুনছি উনি নাকি কুলটির মেশিনারী বিক্রী করার ব্যাপারে মোটা কিছু ঘুঁষ খেয়েছেন। কী ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। কুলটির ইউনিয়ন থেকে লোক এসেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলে জানাব পরে।

তিন দিন পরে মনোতোষের টেলিগ্রাম পেলাম। লিখেছে, হেড অফিসেও স্ট্রাইক হয়েছে। যদি পারেন চলে আসুন। সজল ওপক্ষে। আপনি এলে খুব ভাল হয়।

আমি যাইনি। কী দরকার ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে! বেশ আছি নিশ্চিন্তে। দু'মাস স্ট্রাইক চললেও আমি চালিয়ে নিতে পারব এখানে। ইতিমধ্যে দীপালীর সঙ্গে বন্ধুত্বটা ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়ে গেছে। ও কলকাতায় বদলী না হয়ে গেলে হয়তো এতদিনে রেজিষ্ট্রি করিয়ে নিত। ওর সঙ্গে তর্কে যুক্তিতে পেরে উঠি না। বলে, শুভ্রার ওপর এখনো এত টান তোমার? সারা জীবন সন্ন্যাসী হয়ে থাকবে নাকি?

সব স্ট্রাইকই শেষ হয় একদিন। এটাও হলো। চিঠি এলো সজলের: তোমার প্রোমোশন হয়েছে আমার জায়গায়। আমার আণ্ডারেই কাজ করতে হবে। শীগ্রি অফিসিয়াল অর্ডার পাবে।

সজল উপকারী বন্ধু, তাছাড়া আমার সিনিয়র চাকরীতে। ভালই হল। মনে মনে খুশী হলাম কলকাতা ফিরতে পারব জেনে। দীপালীকে প্রফেসারি ছাড়তে হবে না। তা ছাড়া, আমার মাইনেও বাড়বে। উৎফুল্ল হয়ে উঠলাম। হিমাদ্রিবাবুর কী হলো সে কথা জানার জন্য এতটুকু আগ্রহ নেই আমার।

দীপালীকে জানালাম। টেলিগ্রাম এলো, কনগ্রাট্স. কবে আসছ? শীগ্রি এসো। বাবা খুব খুশী হবে জানলে।

মিনিটগুলি ঘণ্টার মত দীর্ঘ হলো, এক একটা দিনকে মনে হতে লাগলো বছরের মতো। অবশেষে অর্ডারটা এলো দিন দশেক পরে।

কলকাতা ফিরেছি পরশু দিন। আজ অফিসে গিয়ে দেখলাম অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মনোজবাবু পুরোপুরি জি-এম্ হয়েছেন। সজল ডি, জি,

এম। আরো নতুন নতুন লোক নেওয়া হয়েছে। বনবিহারীবাবু, নারায়ণ সেন, অমর, মনোতোষ ওদের কাউকে দেখলাম না।

সজল বললো, বড্ডো বাড়াবাড়ি করছিলো ওরা। অর্থাৎ ষ্ট্রাইকে চাকরী গেছে সেটা প্রথমেই বুঝেছিলাম।

শুধোলাম, হিমাদ্রিবাবুর কী হলো?

সজলের মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠলো, এখানে নয়, পরে বলবো তোমাকে। অফিসে ওঁর নাম কোরো না কোনদিন। কর্তারা ভীষণ খাপ্পা। চলো, তোমাকে য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসারের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

—জি. এম, আবার য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, লায়ার্জ অফিসার? ব্যাপার কী? এত টপ অফিসারে মিলে করবে কি?

সজল বলল, লায়ার্জ অফিসারের নাম পাল্টে য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার হয়েছে। চলো না দেখবে।

দেখলাম তখন যে লোকটিকে এয়ারকণ্ডিশন কোম্পানীর প্রতিনিধি ভেবে ছিলাম তিনিই য়্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।

চুরুটের পাশ দিয়ে উচ্চারণ করলেন, গ্ল্যাড টা মীট ইউ, মিঃ চ্যাটার্জী। আপনার রুমটা তৈরী হতে দিন দুই দেরী হবে। মিস্ত্রিগুলো ডোবাবে দেখছি আমাকে। কোথায় যে আপনাকে বসতে দিই—

সজল বললো, আপনি ভাববেন না মিঃ তালুকদার। উই আর ওল্ড ফ্রেণ্ডস্। উনি এ ক'দিন আমার ঘরেই বসবেন।

মিঃ তালুকদার বললেন, থ্যাঙ্ক ইউ, সজল। অর্থাৎ সজলকে উনি কৃপার পাত্র হিসাবে দেখেন।

মনে মনে একটু চটেছিলাম নতুন একজন অফিসারের মুরুব্বিয়ানার ভাব দেখে। বাইরে এসে বললাম ভদ্রলোক শুধু চালিয়াৎ নয়, অহঙ্কারী। তোমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলে, সবে তো ঢুকেছে—

সজল বললো, চুপ, চুপ। ভবিষ্যতে হয়তো উনিই জি. এম. হবেন। এমন কি অন্যতম ডাইরেক্টর হলেও অবাক হবো না। খাতির করতেই হবে, ভাই।

—তার মানে চৌধুরী সাহেবের আত্মীয়?

—হতে চলেছেন। ব'লে সজল একটু হাসলো।

বললাম, আই সী। তা যদি হয়, তবে অবশ্য সে তুলনায় অহঙ্কারী বা চালিয়াৎ বলা চলে না। আই উইদড্র।

সজল পিঠ চাপড়ালো, কিছু ভেবো না। আমি আছি তোমার পিছনে। বাইরে থেকে ওই রকম মনে হয়। কিন্তু লোকটা আসলে খারাপ নয়।

তারপর ঘরে এসে বললো, অফিসারদের মধ্যে পুরোনো লোক তুমি আমি আর মনোজবাবু। চিন্তার কিছু নেই। বয়স অল্প, একটু উচ্ছল তো হবেই। আই নো হাউ টু ম্যানেজ হিম।

ছুটির পর এক সঙ্গেই বার হলাম। সজলকে বল্লাম, চলো, আমার মেসটা চিনে যাবে।

সজল বললো, মীর্জাপুর স্ট্রীটে তো? চলো, পথেই তো পড়বে। মেসে এসে চা খেতে খেতে সজল বলল, বাসা-টাসা নাও এবার একটা। আর কতদিন এভাবে চালাবে? হ্যাঁ, বিয়ে টিয়ে করছ কবে? শুনছিলাম কোথায় নাকি প্রফেসারি করে?

হেসে স্বীকার করলাম, হ্যাঁ। শীগ্রিই জানতে পারবে। একটু অসুবিধা ছিল, তা তুমি সেটুকু ম্যানেজ করে দিয়েছ।

—ও, বুঝেছি। কলকাতায় ট্রানস্ফার না হলে ওঁর জন্য দিল্লীতে চাকরী খুঁজতে হোতো, তাই না? গুড্, তবে তো ডবল খাওয়া পাওনা। বোলো শ্রীমতীকে। দেখা করেছ তো?

—এই যাবো সন্ধ্যের পর। ভোর বেলা তো এসে পৌঁছালাম।

সজল বললো, তাহলে হিমাদ্রিবাবুর মেয়েকে বিয়ে না করে জিতেছই বলো। প্রোমোশনও পেলে, প্রফেসার বউ পাচ্ছ।

সেল্‌স্ ম্যানেজারের আদুরে জেদী মেয়ের কালো গভীর জ্বালাময় চোখ দুটোয় যে আকুতি সেদিন দেখেছিলাম সেই দৃশ্যটা হঠাৎ মনে পড়লো।

বললাম, হিমাদ্রিবাবুর খবর কি বললে না তো।

সজল বললে, আসলে কী জানো, ভদ্রলোক বোকা ছিলেন। রাদার টু অনেস্ট। চুরি-টুরি উনি করেননি। কর্তাদের চুরি ধরতে গিয়েই বিপদে পড়েছিলেন। কী দরকার ছিল ওঁর, যার টাকা সে যদি চুরি করে করুক। ওঁর কি মাথা-ব্যথা ছিল? যখন বুঝলেন, মনোজবাবুর অংশ সামান্য, আসলে কর্তাদের জন্যেই তিনি টাকা সরিয়েছেন তখন চেপে গেলেই পারতেন।

বিস্মিত হয়ে বললাম, উনি তাহলে চুরি করেননি? তবে মনোজবাবুকে বাঁচাবার জন্যেই উনি সেবার—?

—সেই জন্যই তো ওঁর জিদ চেপেছিল মনোজবাবুকে সরাতে দেবেন না।

আমি ব্যাপারটা জানতে পেরেছিলাম বলেই সেবার মিটমাট করে ফেললাম। কর্তারা তো প্রায় মনোজবাবুকে স্কেপগোট করার জন্য—

—তা হলে পরে আবার ওঁর নামে যে বদনাম রটেছিল সেটাও মিথ্যে ?

সজল বললো, তা ছাড়া কি ? গিভ্ দি ডগ্ এ ব্যাড নেম এণ্ড হ্যাংগ ইট। ব্যানার্জী সাহেবের অবশ্য দোষ আছে। ওঁর অনেষ্টি আর এফিসিয়েন্সির জন্য ওঁকে জি. এম্ করলো কিন্তু উনি মানিয়ে নিতে পারলেন না। চুরি বন্ধ করতে গেলেন, কুলটির ব্যাপারটায় জিদ ধরে রইলেন। মালিকরা আর কতদিন সহ্য করবে ? শেষে এমন হল উনি রেজিগনেশন দিলেন।

আমার মাথার মধ্যে সমস্ত শিরাগুলো দপ্‌দপ্ করছে।

সজল বললো, কী হলো ? তোমার কি শরীর খারাপ করছে ?

বললাম না। আচ্ছা ওঁরা কি সেই বাড়ীতেই আছেন জানো ?

আমার দিকে তাকিয়ে ভয় পেল সজল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কী জানি। আমি তো খোঁজ রাখি না। গত মাসে ওঁর প্রাপ্য টাকা চেকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। আচ্ছা আমি চলি, ভাই।

সজল চলে যাওয়ার পর শুভ্রাদের বাড়ী গিয়েছিলাম। সেখানে পাইনি, শুনলাম ওরা কৃষ্ণনগরে দেশের বাড়ীতে চলে গেছে। ঠিকানাটা জোগাড় করেছি।

দীপালীর সঙ্গে দেখা করা হয়নি। কৃষ্ণনগর চলেছি আমি।

কী বলবে শুভ্রা ? জানি, বলবে : আমি জানতাম তুমি একদিন তোমাদের ভুল বুঝতে পারবে।

কিন্তু আমি কী বলবো ? কী কৈফিয়ৎ দেব আমার গত দু'বছরের কলঙ্কিত আচরণের ?

জানি না। শুধু জানি শুভ্রা ক্ষমা করবে।

প্রতিরোধ

মণি সেন ? বলো কী হে ? উৎসাহে উঠে বসলেন মহেন্দ্র চক্রবর্তী—and without any casualties ! That's good, very good, I must say, তুমি নিশ্চয়ই খুব টায়াড´। যাও যাও। বিশ্রাম করো এবার।

হ্যাঁ ট্রায়াড´ তো নিশ্চয়ই। কাল দুপুর থেকে শুরু হয়েছে। এক মিনিট বিশ্রাম হয়নি। প্রথমে একটা রিপোর্ট তো দিতে হবে। য়্যারেস্টেড লোকগুলোর লিস্টটা এগিয়ে দিয়ে বিমলেন্দু বলল, মণি সেনকে আহত অজ্ঞান অবস্থায় পাওয়া গেছে, স্যার। কোন বাধাই দেয়নি এ লোকগুলো। শচী বোসের আসল দলটা হরিবাবুদের সঙ্গে একটা ক্ল্যাশের পর পালিয়ে গিয়েছিল আমাদের পৌছবার আগেই ! ওদের কাউকে পাওয়া যায়নি।

—Never mind, মণি সেনকে পেয়েছ সেটা খুব ইম্পরট্যান্ট। দলের আসল মাথা তো মণি সেন—

বিমলেন্দু মহেন্দ্রর কথার মাঝখানেই বলে ফেলল, আমার কিন্তু এখনো সন্দেহ আছে, স্যার। মণি সেন আর শচী বোসের মধ্যে একটা মতান্তরের কথা শুনেছিলাম—

সিগারেটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে হাসলেন মহেন্দ্র, য়্যারেস্ট করে এনেছ স্পট থেকে, তবুও তোমার সন্দেহ যাচ্ছে না ?

তারপর আবার চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন। —বয়স বাড়ুক, অভিজ্ঞতা হোক আমাদের মতন, তখন বুঝবে। আরে বোসো, বোসো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? বোসো। তুমি তো আজকের হীরো হে। দেখো ব্যাটাচ্ছেলেগুলোর একটু কাণ্ডজ্ঞান যদি থাকে—চা-টা দিক তোমাকে—জগদীশ, এই উল্লুক—

জগদীশ একেবারে চায়ের ট্রে নিয়েই ঢুকলো। স্কুলের সেক্রেটারী সুবিনয় চ্যাটার্জীর ব্যবস্থার তুলনা নেই। জগদীশের পিছনে আরো তিনজন স্থানীয় লোক। হাতে বড় বড় প্লেটের ওপর লুচি, আলুভাজা, অমলেট। মহেন্দ্র ইশারা করলেন বিমলেন্দুর সামনে দিতে।

—আপনার স্যার ?

—আমার কখন হয়ে গেছে। সুবিনয়বাবুর পাকা ব্যবস্থা হে। খাও। ঠাণ্ডা কোরো না। জগদীশ, চা বরং আর এক কাপ দাও আমাকে।

গোগ্রাসে গিলল বিমলেন্দু। কাল দুপুরের পর থেকে এখন পর্যন্ত পেটে কিছু পড়ে নি, চা ছাড়া। তার ওপর ধকল যা গেছে। থানা থেকে বেরিয়ে পাক্কা দশ মাইল রাস্তা—কাঁটা বন, খানাখন্দ, জঙ্গল, কাদা জল। প্ল্যান ছিল সকালে এখানে পৌছে, দুপুরে বিশ্রাম ক'রে আজ সন্ধ্যায় সার্চ শুরু হবে। বিশ্রাম আর হয়ে ওঠেনি। মুখহাত ধুয়ে চা খেতে খেতেই খবর এসেছিল শচী বোসের একটা দলকে পাঁচগাছিয়ার কাছে দেখা গেছে। হরি চৌধুরীর দল তৈরী হয়ে আছে, ওদের ঘিরে ফেলবে। এখুনি যদি পুলিশ পার্টি পাঠানো হয় তবে দলকে দল ধরা যেতে পারে।

এ খবরের পর বিশ্রামের কথাই ওঠে না। আরো দু'জন এস. আই. ছিল, কিন্তু মহেন্দ্র বিমলেন্দুকেই বেছে নিয়েছিলেন।

—তোমার ওপরই ভার দিলাম, বিমল। এটা একটা বড় কাজ, তোমার ওপর আস্থা আছে আমার।

বিমলেন্দু য়্যাটেনশন হয়ে স্যালুট দিয়েছিল D. S. P.-কে : Thank you sir, I'll do my best.

কাজের ভার দিয়ে ক্যাম্পখাটে গা এলিয়ে দিয়েছিলেন মহেন্দ্র। কৈফিয়তের সুরেই যেন বলেছিলেন, তোমাদের বয়সে দৌড়ঝাঁপ অনেক করেছি হে। কাজ পেলে উৎসাহ বোধ করতাম। নাওয়া-খাওয়া জ্ঞান থাকতো না। আজকাল আর পারি না—শরীরে সয় না।

মনে মনে জ্বলছিল বিমলেন্দু—কিন্তু একটা গর্ববোধও ছিল, ওঁকেই চক্রবর্তী সাহেব বেছে নিয়েছেন এমন একটা গুরু দায়িত্বের জন্য। বিমলেন্দুকে বলতে হয়েছিল, সে তো ঠিক কথাই স্যার। তা ছাড়া আমরা থাকতে—

—That's it. তোমাদেরও তো চান্স পাওয়া চাই হে কাজ দেখাবার। হ্যাঁ, শোনো। Ammunition ঠিকমত নিও। কোন রকম resistance দেখলে ফায়ার করতে দ্বিধা করো না। কৈফিয়ৎ একটা দেখিয়ে দেওয়া যাবে। কে আসছে এই অজ জংলা গাঁয়ে চেক্ করতে? সে আমি সামলাবো। মোট কথা যে কটাকে পারো—alive বা dead—আনা চাই, বুঝতে পেরেছ?

বিমলেন্দু বলল, হ্যাঁ, স্যার।

—তা হলে আর দেরী কোরো না। বেরিয়ে পড়ো। যতটা তাড়াতাড়ি

পারো পা চালিয়ে যাবে—It's a battle, you know.

পঁচিশ জন আর্মড কনেস্টব্‌ল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল বিমলেন্দু—ফিরেছে এইমাত্র।

কট্টর শচী বোসকে পাওয়া যায়নি, পাওয়া গেছে মণি সেনকে। আগে শোনা গিয়েছিল মণি সেন দাঙ্গাহাঙ্গামার বিরুদ্ধে এবং সেই নিয়ে প্রচণ্ড মতান্তর হয়ে গেছে শচী বোসের সঙ্গে। সেই মণি সেনকে অজ্ঞান অবস্থায় জঙ্গলের ধারে একা পাওয়া গেছে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বিমলেন্দুর লিস্টটার ওপর নজর বোলাতে বোলাতে মহেন্দ্র বললেন, তোমাদের থিওরী ভুল, বুঝলে হে। আমি বলছি শোনো। মণি সেন ওদের ওপেন ফ্রন্ট। বাইরে একটু নরম নরম ভাব দেখাবে, মিটমাটের কথা বলবে—যাতে ওরা বাইরে থেকে খবরাখবর জোগাতে পারে। আর্মড দলটা ধরা পড়লেই ওরা আবার রিক্রুট করে পাঠাবে। মণি সেনকে তুমি চেন না। বক্তৃতায় আগুন ছোটায়, লোক ক্ষেপাতে ওস্তাদ।

এখন আর তর্কে নামতে ইচ্ছা করছিল না। চোখ জ্বালা করছে, সারা শরীর ভেঙে পড়ছে। বিমলেন্দু বলল, আমি তাহলে যাই স্যার?

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। পুরো রিপোর্ট পরে শুনবো। তুমি একটু রেস্ট নিয়ে নাও।

তবু বিমলেন্দুর বিবেকটা একবার খোঁচা দিল। বলল—মণি সেনের জন্যে একজন ডাক্তার পাওয়া যায় না, স্যার?

—পাওয়া যায় না মানে? পেতেই হবে। জ্ঞান না ফিরলে interrogate করবো কি করে? সুবিনয় বাবু আছেন যখন, ডাক্তার নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। দরকার হলে ডুলি পাঠিয়ে আনতে হবে। ওসব তোমাকে ভাবতে হবে না, বিমল। You have done your job.

মণি সেনকে পাওয়ায় খুশী হয়েছেন মহেন্দ্র। নতুবা, বিমল জানে, শুধু গোটা পনের বাগদী বাউড়ি চাষী ধরে আনলে গালাগালিই জুটতো কপালে।

মহেন্দ্র চক্রবর্তী যাই বলুন, বিমলেন্দু এখনো বিশ্বাস করতে পারছে না মণি সেন এই দাঙ্গার মধ্যে ছিল। মণি সেন যদি শচী বোসের দলেরও নেতা হতো তবে কি ওরা ওঁকে আহত অবস্থায় ফেলে পালাতো? হরি চৌধুরী নিজেই বলেছে আসল দলটার সঙ্গে মণি সেন ছিল না। শচী বোসের

লোকদের বন্দুক ছিল তিনটে—একটাও পাওয়া যায় নি। যাদের ধরা হয়েছে তারা পাঁচগাছিয়ারই লোক। ওরা বলেছে মণি সেনকে দু দলের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে দেখেছে ওরা। তা ছাড়া সুবিনয়বাবুর আগের রিপোর্টও ছিল তাই—ওরা নিজেরাই এবার মারামারি করবে। মণি সেনের নামে পোস্টার দিয়েছে ওরা: মণি সেন বিশ্বাসঘাতক, জমিদার বড়লোকের দালাল মণি সেন, সাবধান। অথচ ··

চুলোয় যাক। এ নিয়ে বিমলেন্দু মাথা ঘামিয়ে কী করবে? ওপরওলার হুকুম তামিল করেছে সে, এবার একটু ঘুমোবে।

মণি সেনের জ্ঞান ফেরাবার ব্যবস্থা করে মহেন্দ্র একবার হাত-বাঁধা লোকগুলোকে দেখে নিলেন। আঃ, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। কিন্তু মহেন্দ্র চক্রবর্তীকে চেন না তোমরা। সাঁড়াশি দিয়ে পেটের মধ্যে থেকে কথা বার করবো আমি! তোমরা যে মিটমিটে শয়তান সে আর আমার বুঝতে বাকী নেই। তোমাদের সমর্থন না পেলে শচী বোস মণি সেন খুনজখম লুটপাট করে বেড়াতে পারতো?

ভালোয় ভালোয় দলবলের নামঠিকানা আস্তানা বলে দাও তো ভালো। চালান যাও, তারপর যা হয় হোক, আমি কিছু জানি না। কিন্তু বদমায়েসি করলে আমিও শয়তান। আসল দলটাকে না পেলে তোমাদেরই শায়েস্তা করবো। যাতে আর কোনদিন মাথা তুলতে না পারো।

অবশ্য শচী বোসের আস্তানার কথা নাও জানতে পারে। ঘুঘু লোক। যেভাবে দল তৈরী করেছে, এক জায়গায় না থাকারই কথা। যদি জানে তো লীডার মণি সেন জানবে। আর জানলে, না বলে পার পাবে না সে। কাঁধে করে আনতে হয়েছে বাবুকে—আচ্ছা, জ্ঞান ফিরুক। তারপর দেখা যাবে।

আপাতত দু'নম্বর দিয়েই শুরু করা যাক।

বাঘ যেমন করে শিকার দেখে, তেমনি করে তাকিয়ে তাকিয়ে মহেন্দ্র দেখলেন বুড়ো লোকটাকে। নাঃ, এ লোকটাকে বোধ হয় সহজেই ম্যানেজ করা যাবে।

হিংস্র ভঙ্গীটা পাল্টে মহেন্দ্র জমিদারী সুরে বললেন, কী নাম রে তোর?

—আজ্ঞা, জগো সদ্দার।

—সর্দার, কিসের সর্দার রে? ডাকাতের দলটল আছে নাকি?

হাত জোড় করে বুড়ো বলল, না, আজ্ঞা। বাগ্দী আমরা। সরকারের খাতায় ওই নেকা আচে।

—ও, তাই বল্, সর্দার তোর উপাধি। তা এদের দলে ভিড়েছিস কতদিন?

—আজ্ঞা?

—মণি সেন, শচী বোসকে জানিস তো—ওই দল রে। কতদিন নাম লিখিয়েছিস? মারপিটও করেছিস তো?

—আজ্ঞা, নামটাম তো নেকাই নেই। আমি বুড়ো মানুষ, মারপিট কি করতে পারি, হুজুর?

মহেন্দ্র দৃষ্টি দিয়ে যেন বিঁধে ফেলতে চাইলেন। তারপর আবার সেই মোলায়েম স্বরে বললেন, ওরে বাবা, তা বললে কি হয়। তোর ঘর থেকে লাঠি-সড়কি বেরিয়েছে, আর তুই বলছিস কিছু করিস না! লাঠি-সড়কি কি তা হলে ধূনো গঙ্গাজল দিয়ে পুজো করিস? ঠিক ঠিক, বল্, কিচ্ছু ভয় নেই। নইলে মরবি কিন্তু বলে দিলাম। কী? বলবি, না জেল ফাঁসি যাবি?

—না হুজুর। মা কালীর দিব্যি বলছি মারপিট করি নাই। গাঁয়ে ঘরে লাটি সোঁটা সবার থাকে।

—বেশ। মারামারি তো করিস নি, কিন্তু জমি দখল করে চাষ করতে তো গিয়েছিলি?

—আজ্ঞা, সত্যি কতা বলবো, তা বেচি। বাবার জোত হুজুর, ছোটকাল থেকে দেকিচি বাবা চাষ করেচে. আমিও করিচি, তাই গেইছিলাম। কেড়ে নিতে যাই নাই।

—ওই হলো রে বেটা। যার জমি সে যদি না দেয়, তুই চষবি কী করে? জমি তো আর তোর নয়!

—তা'লে যে ছেলেপিলে নিয়ে উপোস করে মরবো হুজুর। আমরা গরীব মানুষ কী খাবো, হুজুর?

অ? আমি নয়, আমরা। দলে আছো তা হলে? মহেন্দ্রর হঠাৎ রাগ হয়ে গেল।—ঘাস খাবি, ঘাস। বুঝলি? ঘাসের অভাব নেই মাঠে।

জগো সর্দার অবাক। হুজুর ঠাট্টা করছেন। অপ্রস্তুত হাসি হেসে বলল, ইটা কী বলচেন, হুজুর? ঘাস খেয়ে কী মানুষে বাঁচে?

হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন মহেন্দ্র—না বাঁচিস, মরবি। তা বলে দল বেঁধে জবর

দখল জমি চাষ করবি, হারামজাদারা! পেট চলে না বলে ডাকাতি করবি?

ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গেল জগো—না, হুজুর। ডাকাতি করবো কেনে!

—তবে? জোর করে পরের জমি চাষ করা ডাকাতি নয়?

জগো সর্দার ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তাকিয়ে কী ভাবলো। তারপর বললো, বাবুরা যে বললে, আইন হয়েচে, ভাগের জোদ্দারকে ছাড়ানো চলবে না, ভাগের জমি ভাগে দিতে হবে। এ সব সত্যি লয়?

জগো আরো কী বলতে যাচ্ছিল, মহেন্দ্র থামিয়ে দিয়ে টেবিলে একটা থাপ্পড় মেরে বললেন, এই, এতক্ষণে একটা কাজের কথা বলেছিস। ওই বাবুরা বুঝিয়েছে তো লাঙ্গল যার জমি তার?

—আজ্ঞা, তা লয়। বলেচে, ভাগের জমি ছাড়িয়ে নেয়া চলবে না।

খিঁচিয়ে উঠলেন মহেন্দ্র,—আর যদি নেয় তো ঝাড়ে বংশে খুন করে ফেলতে হবে, য়্যাঁ? তা কোন্‌ বাবুরা বলেচে তাই তো জানতে চাইছি। কে বলেছে—শচীবাবু, না মণি সেন? না কি তুই শেয়ালেরই এক রা?

মাথা নাড়লো জগো।—খুনের কতা তো বলে নাই।

—বলে নাই। জগোর স্বরটা নকল করলেন মহেন্দ্র। বলে নাই তো হোল কেন? বলি, গোপী বাঁড়ুজ্যে খুন হয় নাই?

—আজ্ঞা, হয়েচে। কিন্তুক সে আলাদা বিত্তান্ত, হুজুর।

—আ-লা-দা বি-ত্তা-ন্ত? ও বাবা, বেশ ভালো বাঙলা বলিস্‌ তো দেখছি! তা বেশ, বল্‌, তোর আলাদা বিত্তান্তটা শুনি।

জগো সর্দার একটু কাছে এগিয়ে এলো। গলা নামিয়ে গোপন কথা বলার ভঙ্গীতে বললো,—শুদু ধানের জন্যে তো লয়, গুপীবাবুর নানান্‌ দোষ ছিল যে। ঝি-বৌদের ওপর বড্ডো নজর। তা কদ্দিন আর সয় মানুষের? শেষ পঞ্চন্ত নকুলোর বৌটাকে গুম করে ফেলাতে ক্ষেপে উঠলো গাঁয়ের নোক—দিলে সাবাড় করে।

খুবই স্বাভাবিক। এ তো হতেই পারে। তবে এর মধ্যে শচী বোস কি মণি সেনের হাত ছিল নিশ্চয়ই। নইলে বাউড়ি বাগ্দী চাষাভুষো লোকদের কী সাহস হয় একটা ভদ্রলোকের গায়ে হাত তোলার? তা সে যতো লম্পটই হোক। আর হাত তোলা শুধু নয়, একেবারে খুন! তার মানে মণি সেন বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে ক্ষেপিয়েছে লোকগুলোকে—তারপরে যা হয়—শচী বোস ক্ষেপানো লোকগুলোকে নিয়ে মারমুখী দল গড়েছে। তা সে যাই হোক, জগো

ছটফট করছিল ছিলিমের জন্যে, সিগারেট দেখে চোখদুটো জলজল্ করে উঠলো। হাত বাড়িয়ে সিগারেটটা কুড়িয়ে নিতে গিয়েও থমকে গেল। মহেন্দ্রর দিকে তাকিয়ে দেখলো ভয়ে ভয়ে। বাপ্ রে! হুজুরের ছিগ্রেট।

প্রশ্রয়ের হাসি হেসে মহেন্দ্র বললেন, কী হলো? আমি দিচ্ছি, নে! কোন ভয় নেই তোর, নে। আমার কাছে সত্যি কথা বললে কোন ভয় নেই।

সিগারেটটা তুলে নিয়ে পরম যত্নে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে দেখতে জগো বললো, আজ্ঞা, হুজুর আপনার ছামুতে—বলছেন, খাবো?

মহেন্দ্রর খেয়াল হতে দিশলাইটা এগিয়ে দিলেন, বোস, বসে বসে খা। আমি মানুষ চিনি রে, বেটা। কোন ভয় নেই। হাঁ, তারপরে কী হলো? ছেলেছোকরাগুলো গোপী বাঁড়ুজ্জেকে খতম করে দিলো। তা, সে লোকটা নয় বদমাইস ছিল। কিন্তু ওর ভাগ্নেটাকে আবার খুন করতে গেল কেন?

জগো হাতে কলকে ধরার মত সিগারেটটা খাচ্ছিল। মুখ থেকে হাত নামিয়ে ধোঁয়া গিলে বললে, সে হয় বাবু। আগের মাতায় ছামুতে পড়লে হয়। আগ তো চণ্ডাল। এই দেকুন কেনে, মণিবাবুর মত ভালো মানুষটা পজ্জন্ত মার খেয়ে গেল। কেনে না বলেছেলো ওসব করিস না। তা হুজুর, মণিবাবু বাঁচবে তো?

মণি সেন বাধা দিতে গিয়েছিল? আগের রিপোর্টে সেই রকমই একটা কথা ছিল বটে। কিন্তু মহেন্দ্র বিশ্বাস করেন না। বুড়ো যা শুনেছে তাই বলছে। যা বোঝানো হয়েছে ওকে। মণি সেন কি কচি খোকা যে দুটো দল যখন সড়কি টাঙি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে মারামারি করতে, তখন থামাতে যাবে?

জগো আবার শুধালো, হুজুর, মানুষটা বাঁচবে তো?

মহেন্দ্র অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। জগোর কথায় খেয়াল হল। বললেন সেই চেষ্টাই তো করছি রে। ডাক্তারের বাবস্থা করেছি।

জগো গদগদ।—আপনার দয়ার শরীল হুজুর। ভগবান ভালো করবেন। তা জানেন হুজুর, শচীবাবুর গুরু বলতে গেলে এই ইনিই অথচ—

মহেন্দ্র তখনো ভাবছিলেন। অন্যমনস্ক ভাবে বললেন, শচী বোসই তাহলে মণি সেনকে মেরে বসলো? বল্‌ছিস কিরে, শিষ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত গুরুকে—

মাথা নেড়ে জগো বলল, আজ্ঞা, সে গোলমালের মধ্যে কার নাঠি কার

মাতায় পড়লো তা কি আর কেউ দেকেচে—তবে, ওই হলো। মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল মণিবাবু। —সরে যা তোরা, খুনোখুনি করিস না। শচীবাবু বললে, ছামু থেকে সরে যাও মণিদা, নইলে খাতির করবো না। মণিবাবু নড়ে না—ইদিকে হরি চৌধুরীর দল রে রে করে এসে পড়েচে। পেছুন থেকে একজনা চেঁচিয়ে উঠলো—দালাল বুড়ো, আটকে রাখচে আমাদিকে। মার, ওকেই মার আগে। তা'পরে নাঠি পড়লো—টেনে সরিয়ে দিলে—তা কার নাঠি—কে বলবে।

মহেন্দ্রবাবু ভাবছিলেন, এ বুড়ো তা হলে ছিল অকুস্থলে। নইলে এতো কথা জানার নয়। কিন্তু ঘাঁটালে চলবে না। গল্পের ঝোঁকে যা বলে, বলে যাক্। শুধু একটা নোট করে নিলেন। গোপী বাঁড়ুজ্জেকে খুন করার সময় কে কে ছিল সেটাও বার করে নিতে হবে। বললেন, শচীবাবু আর মণিবাবুর বুঝি খুব রেষারেষি?

—আজ্ঞা, হাঁ। জগো নড়ে চড়ে বলল। তবে শোনেন, হুজুর। সেই কী সব আইন হলো বর্গা জোতের ব্যাপার নিয়ে। শোনলাম, গরমেণ্টের জমি পাওয়া যাবে, চাষ যে করবে তাকে কেউ ছাড়াতে পারবে না। তা কোতায় জমি আর কোতায় চাষ? গরমেণ্টের জমিও পেলাম না, চাষও ছাড়িয়ে নিলে বাবুরা। বললে, ও আমার জমি, আমি চাষ করবো। তা তকোন মণিবাবু শচীবাবু এককাট্টা। বললে, চাষ কর তোরা, তোদের কেউ তাড়াতে পারবে না। তা চাষ করতে গিয়ে দেখি বাবুদের নোকেরা নাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আচে। দেবে না। তকোন শচীবাবু বললে, নিয়ে আয় নাঠি, দেকি কতো নাঠির জোর ওদের। এই হলো সুত্তরপাত। মণিবাবু ঠেকিয়ে দিলে পেতোমবার। বললে, কাকে দিয়ে চাষ করায় দেকবো। কেউ যাবে না। ক'টা দিন যাক, মিটিন্ করো, থানা পুলিশকে জানিয়ে দাও। কত্তাদের সব খবর দাও। তাপরে চাষ হবে। তা বাবু, তখন আউষের সময় মাঠ বেশ ভিজে ভিজে—লাঙলের সময়। কে অতোদিন বসে থাকবে? শেষ পজ্জন্ত চাষ করে ফেল্লাম সবাই মিলে। তা তকোনো পজ্জন্ত ঠিকঠাক আচে। তাপরে ধান কাটতে গিয়ে মাতায় বজ্জাঘাত। বাইরের নোক নিয়ে এয়েচে বাবুরা ওদের দিয়ে ধান কাটিয়ে নেবে। তকোন শচীবাবু বললে নাঠি সড়কি বের কর তোরা, মেরে হাটিয়ে দিয়ে ধান কাট। যারা যারা কেটে নিয়ে গিয়েচে ধান খামার থেকে তুলে আন। মণিবাবু বারণ কল্লে,

তা তকোন আর কে শুনবে। পেটে খিদে, মাতায় আগুন। তা আমি হুজুর, মারদাঙ্গা করিনি।

মহেন্দ্রর মাথায় অন্য জিনিস ঘুরছে। শুধোলেন, তখনো তো মণিবাবু ছিলো?

—ছেলো, হুজুর। বারণ করেছে বটে তবে যকোন ধান কাটলাম তকোন ছেলো। তা শোনেন, আসল গোলমাল এই দল তৈরী নিয়ে। ছেলেছোকরাদের নাঠি, টাঙ্গি, সড়কি, তীরধনুক তৈরী করতে বললে শচীবাবু। বললে, বাবুরা এবার শোধ তুলতে আসবে। তৈরী থাকতে হবে। মণিবাবু বললে, না। এই নিয়ে সুত্তুরপাত। তা শেষ পজ্জন্ত দেকুন হলোও তাই। হরি চৌধুরী, সুবিনোবাবু, গুপী বাঁড়ুজ্জে তো দল তৈরী কল্লে। মারপিট শুরু কল্লে। এই হোলো বেত্তান্ত, হুজুর, শোনেন আমার কাচে।

মহেন্দ্র এবার মন দিয়েই শুনছিলেন। এখন আর কোন সন্দেহ নেই—এই বুড়োও ওই দলে। অনেক খবর রাখে বুড়ো।

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, এই যে তুই বললি, নকলোর বৌ-এর জন্যে খুন হয়েছিল গোপী বাঁড়ুজ্জে। কিন্তু আসলে ওর ওপর অন্য রাগও ছিল, বল্।

—আজ্ঞা, তা ছেল বৈকি। বড্ড নোকের জমি খেয়ে নিয়েচে, হুজুর। মারধোর করেচে কিচু বলতে গেলে। তবে ওই যা বল্লাম—ওই নকুলোর বৌ-টার জন্যেই হলো শেষ পজ্জন্ত।

মহেন্দ্র এবার ঋজু হয়ে বসলেন। জেরা করার ভঙ্গীটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো।
—তা হলে গুপী বাঁড়ুজ্জের ব্যাপারে নকলোই ছিল লীডার—

সঙ্গে সঙ্গে মাথা নাড়লো জগো। —আজ্ঞা, না, হুজুর। নকুলো থাকবে কোতা থেকে? ছ মাস ধরে বিছানায় পড়ে যে পা ভেঙে। ও কি করে যাবে হুজুর? হাঁটতেই পারে না।

—তা হলে শচী বোস নিজেই ছিল, য়্যাঁ?

হঠাৎ চমকে উঠলো জগো সর্দার। খুনের সময় শচীবাবু ছিল কিনা, আর কে কে ছিল জানতে চাইছে। না, না, না।

—কি রে, কথার জবাব দে। ভাম মেরে গেলি যে।

আপন মনে ঘাড় নেড়ে হাত জোড় করলো জগো—সি টি বলতে লারবো

হুজুর। তা'লে খুন করে ফেলাবে।

—কে খুন করবে? শচী বোস? হেসে উঠলেন মহেন্দ্র। টানাজাল পড়েছে রে বেটা, ছেঁকে তুলবো সব কটাকে। খুন আর করতে হবে না— পুলিশ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। পালাবার পথ খুঁজছে সে এখন, দেখ গিয়ে হয়তো জালে পড়েছে এতক্ষণ। হ্যাঁ, তাহলে শচী বোস ছিল স্বীকার করছিস।

—সে আমি বলতে লারচি হুজুর। আমি তো আর ছিলাম না।

মহেন্দ্র অভয় দিলেন ওকে। আরে বেটা তুই ছিলি না তাতো ঠিকই; তবে শুনেছিস তো—

—আজ্ঞা, আমি কিচু শুনি নাই, হুজুর। আবার মাথা নাড়লো জগো— আরে বাপ্‌রে। কী বলতে কী বলে ফেলাবো। না. আজ্ঞা। আমি কিচু জানি না।

বেশ বলছিল বুড়োটা, হঠাৎ সাবধান হয়ে গেছে। মুখ চোখ দেখে মনে হচ্ছে, সহজে আর কিছু ওকে দিয়ে বলানো যাবে না গল্পবাজ বুড়োটা হঠাৎ দলের মানুষ হয়ে গেছে।

মহেন্দ্রর স্বর আরো গম্ভীর রুক্ষ হলো, যদি দুটো একটা নাম না বলিস, তোকেই চালান দেব, জানিস।

জগোর স্বরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে।—চালান তো হয়েই আচি হুজুর; যা হয় হোক। কিন্তু আর কিচ্ছুটি বলব নাই। পই পই করে বলেছেল কানাই, কুনো কতাটি বলবে না। তা অনেক কতা বলে ফেলিচি—

এই তো পথে এসো চাঁদ। লিস্টটা কাছে টেনে নিয়ে দেখতে দেখতে মহেন্দ্রর চোখ খুশীতে ঝলমল করে উঠলো।

জগো সর্দার কিছুটা যেন আঁচ করতে পারলো। উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলে উঠলো, হুজুর?

মহেন্দ্র তাকালেন ওর দিকে।—ভয় পাচ্ছিস! ভয় নেই রে, আমি বলছি ভয় নেই। ঝুলিয়ে দেবো সব ক'টাকে। কেউ তোর কিছু করতে পারবে না। বল আর দু একটা নাম বল, ছেড়ে দেব তোকে। যেমন বললি—

—কী বললাম হুজুর, কী বললাম? আকুপাকু করে উঠলো জগো সর্দার।

এমনি হয়। বোকা হাঁদা লোকগুলো, বলবো না বলবো না করেও বলে দেয়। এদের দিয়ে বিপ্লব করবে শচী বোস! আমি গড়বে!

—হুজুর।

য়্যারেস্ট লিস্টটায় চোখ বুলিয়ে দেখছিলেন মহেন্দ্র। হঠাৎ খুশীতে টেবিলের ওপর একটা কিল মারলেন। —এই তো শ্রীমান্ কানাই চন্দ্র মাঝি হুজুরে হাজির। বহুৎ আচ্ছা, বিমল।—যা বেটা, তোর ছুটি।

চেয়ারে নড়ে চড়ে বসলেন মহেন্দ্র।

হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো জগো সর্দার।—হেই ভগবান, এ কী কল্লাম আমি। এ কী কল্লাম, কানাইকে ধরিয়ে দিলাম! একী পাপ কল্লাম—হে ভগবান, আমি যে দিব্যি খেইছিলাম।

মাথা ঠুকতে শুরু করেছে বুড়োটা। মহেন্দ্র ধমক দিলেন, এই, এই ব্যাটা, করছিস কি হারামজাদা? পাপ নয় রে বেটা, পুণ্যি করেছিস। অনেক পুণ্যে মহেন্দ্র চক্রবর্তীর হাত থেকে এত সহজে ছাড়া পেয়ে গেলি।

বুড়ো উঠে পা ধরতে যাচ্ছিল, একটা লাথির ঠোকরে ছিটকে পড়লো। —ভাগ্ বেটা। মহেন্দ্র হাঁকলেন জগদীশ, কানাই মাঝিকে আন। বুড়োটাকে হাটা এখান থেকে।

মহেন্দ্রর কাছ থেকে কানাই যখন ফিরে এলো, তখন ওর দিকে আর তাকানো যায় না। সারা মুখটা ফুলে চোখ দুটোকে প্রায় ঢেকে ফেলেছে। ঘাড়টা বেঁকে গেছে। বীভৎস দেখাচ্ছে। সামনের দিকে কতকগুলো চুল খাবলা দিয়ে তোলা, সেখানে রক্তের চাপ। কুঁজো হয়ে কোনমতে এসে ধপ্ করে বসে পড়লো।

হাতবাঁধা স্তম্ভিত লোকগুলো বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইলো। কোন কথা বলতে পারছিল না। যেন ভয় হচ্ছে ওদের, ওরা কথা বললে কানাইয়ের কষ্ট বাড়বে। যন্ত্রণায় কুঁকড়ে কানাই বসে বসে হাঁপাচ্ছিল। ওরা তাই দেখতে লাগলো। বিকৃতমুখে চোয়াল চেপে কান্না চাপতে চেষ্টা করছিল বোধ হয়। হঠাৎ একটা গোঙানি বেরিয়ে এলো কানাইয়ের মুখ দিয়ে।

এবারে সবাই সচকিত হয়ে উঠলো—কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারলো না। শুধু মাথা নেড়ে, হাঁটুর মধ্যে মুখ ঘষে ঘষে নিজেদের কান্না রোধ করার চেষ্টা করতে লাগলো।

কিছুক্ষণ পরে নন্দই প্রথমে কথা বললো, শুবি একটু, কানাই? শো।

কানাইয়ের কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। ঘাড় নেড়ে বলতে চাইল, না।

তাও পারল না। আবার একটা অস্ফুট গোঙানি বের হলো গলা থেকে।

বসে বসে ওদের দিকে পিঠ ফেরালো কানাই। না শুতে পারবে না, সারা পিঠ রক্তাক্ত।

হঠাৎ বুড়ো জগো এক কোণে গুমরে কেঁদে উঠলো। আঁ—হা-হা-হা। আমিই তোর নাম বলে ফেলিচি কানাই। আমাকে তোরা শাস্তি দে—মেরে ফেল্—মেরে ফেল্ আমাকে।

জগো দেয়ালে মাথা ঠুকতে শুরু করেছিল। নন্দ ঘড়ঘড়ে ধরা গলায় বললেন, চুপ থাকো, খুড়ো। কেলেঙ্কারী কোরো না। যা হবার তা হয়েচে—তুমি আর মাতা খুঁড়ে কী করবে? মরতে যদি হয়, তা একটা কিছু করে মরো।

কানাই আবার ঘুরে বসলো, যেন নন্দকে সমর্থন করলো। তারপর আস্তে আস্তে মুখ তুলে কোনরকমে ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, আমি কিন্তু কারো নাম বলিনি।

ওরা ঘষটে ঘষটে এগিয়ে এলো একটু কাছাকাছি। যেন কানাইয়ের গায়ে মুখে হাত বুলিয়ে দিতে চাইছে। না, হাত বোলানো যাবে না। কোথায় হাত বুলিয়ে দেবে ওরা? সারা গায়েই মহেন্দ্র চক্রবর্তীর বেণ্টের দাগ। তা ছাড়া ওদের হাত তো বাঁধা।

আবার মাথা নীচু করে ওরা ভাবতে লাগলো, এবার কার পালা। সে কি পারবে কানাই-এর মত গোঁ ধরে থাকতে? শচী বোসকে ধরিয়ে দেবে না তো? কানাই একসময় বললো, একটু জল যদি পেতাম।

জল? হ্যাঁ, জল দিতে পারলে কানাই-এর কষ্টের কিছুটা লাঘব হতো বটে। কিন্তু, কিন্তু কোথায় পাবে জল? জল ওরা দেবে না। এসেই জল চাওয়ায় একটা পুলিস বলেছিল, পেচ্ছাব করে খা শালারা। অনেক ভুগিয়েছিস।

জল এক বালতি এসেছিল অচেতন মণি সেনের জ্ঞান ফেরাবার জন্য। তাও শেষ হয়ে গেছে। শূন্য বালতিটার দিকে সবাই একসঙ্গে তাকালো।

হঠাৎ ময়নার নজরে পড়ল, খানিকটা জল জমে আছে ওখানে। সবারই মুখের দিকে তাকালো সে—হ্যাঁ, ওরাও সেই কথাই ভাবছে। কিন্তু ওদের হাত যে একসঙ্গে বাঁধা। একমাত্র জগো খুড়োর হাত খোলা আছে।

হ্যাঁ, জগোও বুঝেছে বৈকি। হাতে করে আনতে গেলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হবে। জগো ওর কাপড়ের খুঁট ভিজিয়ে কানাইয়ের মুখে নিঙড়ে দিতে লাগলো।

হঠাৎ হিসিয়ে উঠলো নন্দ—দালালের কত খাতির দেকেচো। দেকে রাকো, চিনে রাকো তোমরা। মণিবাবুর জন্তে ডাক্তার এয়েচে। শালা, বেরুই একবার তারপর দেকাচ্ছি।

কানাই জল খেয়ে একটু সুস্থ হয়েছিল, ভাঙাভাঙা ক্লান্ত গলায় বলল, শচীবাবু যদি ধরা পড়ে, তবে বুঝতে হবে, মণিবাবুর কাজ।

নন্দ বলল, তা'লে সবা.চ আগে এই শালাকে খুন কত্তে হবে।

জগো আঁতকে উঠে প্রতিবাদ জানালো—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। ঘরের শত্রু বিভীষণকে আগে শেষ করতে হবে।

মহেন্দ্র চক্রবর্তী তখন মণি সেনের ডান হাতের কবজীতে মোচড় দিচ্ছেন:

বলুন, বলুন…… ..আরে মশাই, শচী বোস তো আপনার শত্রু ..কেন মিছিমিছি কষ্ট পাচ্ছেন …..বুঝতেই পারছেন, শচী বোসকে না পেলে চলবে না …..তাতে আপনারই সুবিধে . . আপনি যেমন নেতা ছিলেন তেমনি থাকবেন—বলুন, বলুন—শচী বোস কোথায় আছে এখন? বলুন ….. দেখলেন তো আপনাকে ফেলে কেমন পালালো। …..ওরা তো খুন করে ফেলতেই চেয়েছিল …—কি বোকা আপনি …..জানেন না? জানেন জানেন। এতদিন তো এক দলেই ছিলেন, ঘাঁটিগুলো কোথায় সে আপনি নিশ্চয়ই জানেন …এই তো ছেড়ে দিয়েছি— বলুন এবার।

… ..নাঃ তবুও না। তবে শালা আমি যা ভেবেছি তাই ঠিক। তুমিও ওই দলে, ওপেন ফ্রন্ট। দেখাচ্ছি--

ব্যাটনের ঘা-টা ঠিক লাগলো না। হাণ্ডকাফে লেগে ঠক্ করে উঠলো। … ..ও এখনো-তেজ? তেজ তোমার ভাঙছি দাঁড়াও।

দুটো ব্যাটন দিয়ে গলার দু'পাশ চেপে ধরলেন মহেন্দ্র।

……এবার, এবার? ভেবেছ অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলে বলে ছেড়ে দেব তোমাকে? না বলে পার পাবে না।… ..এবার? এবার আর কতক্ষণ যুঝবে? শালা……এবার……এবার… যা শালা ..আবার অজ্ঞান হয়ে গেল—যোগেন, ব্র্যাণ্ডি।

মহেন্দ্র চক্রবর্তী চেয়ারে বসে ঘাম মুছতে লাগলেন। আবার সেই বিয়াল্লিশের কথা মনে পড়ছে। শালারা বড্ড ভোগায়। ভাঙে তবু মচকাতে চায় না।

মিনিট কুড়ি পরে আবার শুরু করলেন মহেন্দ্র।

যন্ত্রণাতরঙ্গ কিন্তু মণি সেনের মস্তিষ্কে পৌছায় না, বিপরীত এক শক্তি-প্রবাহে প্রতিহত হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়।

······না না না। মতান্তর হয়েছে বলে ধরিয়ে দেবো শচীকে? বিশ্বাস-ঘাতকতা করব আমি? শচীকে তো আমিই এ পথে এনেছি—শচীর ওপর কত ভরসা ওদের। ভুল করছে শচী, কিন্তু তার সাহস আছে, আদর্শ-নিষ্ঠা আছে, সাংগঠনিক ক্ষমতা আছে। পথ আমাদের পৃথক হোক, মত ভন্ন হোক—কিন্তু আদর্শ তো এক। শচী আর আমি জাগিয়েছি মানুষ-গুলোকে। তাদের কী আজ মাঝপথে ফেলে পালাব? পুলিসের কাছে হার মানব?···আঃ······না না না। শচী চলে গেলে সব কিছু ভেঙে পড়বে, আবার সবাই পিছিয়ে যাবে কয়েক বছর। না, তা হয় না। আমি বোঝাবো ওদের, শচীকে ফিরিয়ে আনবো সর্বনাশা পথ থেকে। হয়তো অত্যাচারে মুষড়ে পড়বে কিছু দিন। তবু শচী থাকলে, আমি থাকলে, একদিন আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে ওরা। শচী আর আমি এক সঙ্গে লড়বো আবার।·· উঃ—

······এই তো, চোয়াল চেপে ধরেছ। তাহলে কষ্ট হয় তোমারও? কী, বলবে না?······এবার বলবে, বলবে বৈকি···সহ্যের একটা সীমা আছে তো। বিপ্লবী বলে কি যোগী হয়েছো তুমি?···এবার···এবার?

—অাঃ। মণি সেনেব গলা থেকে ঘড়ঘড়ে একটা আওয়াজ উঠলো।

মহেন্দ্রর চোখ দুটো চকচক করে উঠলো। এই তো গোঙানি শুরু হয়েছে, এইবার মুখ খুলবে। এবার একটু দম নিক্।

ব্যাটন দুটো সরিয়ে নিলেন মহেন্দ্র। যাঃ, আবার অজ্ঞান হলো নাকি? একি নিশ্বাস পড়ছে না যে! অাঁতকে উঠলেন মহেন্দ্র চক্রবর্তী।

—ডাক্তার, ডাক্তার, যোগেন, বিমল, জগদীশ—

ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জাঁদরেল পুলিশ অফিসার।

মণি সেনের মাথাটা চেয়ারের একদিকে বিসদৃশভাবে হেলে পড়লো॥

অবরোহণ

লোহার গেটের চাবি খুল্‌লো ঘটাঙ করে। তারপর একটা ধাক্কা।

—যাও, ভিতরে যাও। হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলে কেন ? রাতটা তো কাটাও, তারপর দেখ্‌ছি তোমাদের শায়েস্তা করা যায় কিনা।

অনেক উপরে একটা মিটমিটে আলো জ্বলছে, মুখগুলি দেখা যায় না। তবে বোঝা যায় কেউ ঘুমিয়ে নেই, উস্‌খুস্‌ করছে। জনাআষ্টেক লোক দু'খানা কম্বল আড়াআড়ি করে জড়িয়ে শুয়ে আছে। বাকী ভয়ার্ত ছাগলের মত ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে কাঁপছে ডিসেম্বরের শীতে।

কলকাতা শহরের বিভিন্ন জগতের বিভিন্ন জীবকে এনে ঢোকানো হয়েছে খাঁচাটার মধ্যে। তিনদিকে তিন-মানুষ উঁচু দেওয়াল। উত্তর দিকে লোহার ফটক অর্থাৎ লক্‌-আপ্‌।

যারা বসেছিল তারা সবাই তাকিয়েছিল আমার দিকে বিস্ফারিত চোখে। হয়তো অবাক হয়েছিল। গা টল্‌ছে না, গায়ে রঙবাজির চিহ্নও নেই, চোর-পকেটমার বলেও মনে হয় না, ভদ্রলোকের ছেলে। এ লোক এখানে ! অনুভব করছিলাম ওরা লক্ষ্য করছে আমাকে। কোথায় বসবো ভাবতে ভাবতে নজরে এলো পশ্চিমদিকে দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে একজন অঘোরে ঘুমোচ্ছেন চাদর মুড়ি দিয়ে। মোজা আছে। জামাকাপড়ে যেন সৌখীনতার ছাপ আছে। আংটি আছে। হাতে একটা ঘড়িও চক্‌ চক্‌ করছে। ভদ্রলোক বলেই মনে হলো।

কোনমতে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ভদ্রলোকের দিকে। হঠাৎ কম্বলের ভেতর থেকে একটা বিকট আওয়াজ এলো, কে হে লবাবজাদা, গা মাড়িয়ে যাচ্ছ ?

যারা এককোণে কাঁপছিল তাদের মধ্যেই একটা অল্পবয়সী ছেলে জবাব দিল। নতুন হুটুদা।

—নতুন সে তো বুঝতে পারছি। বলি কেস্‌টা কি ?

আর একজন ব্যঙ্গ মিশ্রিত স্বরে উত্তর দিল—ভদ্দরনোক।

কম্বলের মধ্যেই পাশ ফিরে খিঁচিয়ে উঠ্‌লো সেই লোকটা, ভদ্দলোক তো সব শালা। ওই তো আর এক শালা ভদ্দরলোক শাল-ফাল জড়িয়ে আবার কম্বলের জন্য খেঁকাখেঁকি করছিল। দেখিস্‌ নি? শালা পেঁচি—থুঃ।

থুথু ফেললো লোকটা। ছেলেটা খিক্‌খিক্‌ করে হেসে উঠলো।

ওর মধ্যেই দেখলাম লোকটার আমের গুঁড়ির মত এবড়ো-খেবড়ো বীভৎস মুখে দুটো জ্বলন্ত চোখ। পা দুটো আটকে গেল। ভদ্রলোকের কাছে যেতে আর সাহস হলো না। যেখানে দাঁড়িয়েছিলাম সেখানেই বসে পড়লাম অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে।

দুত্তেরি! বলে হঠাৎ কম্বলটা গুটিয়ে নিয়ে উঠে বসলো লোকটা। ঘুমের ঘোরে পাশের কেউ বোধ হয় টান দিয়েছিল কম্বলে। গর্জে উঠলো, শালা শ্বশুরের মেয়ে নিয়ে নিদ্রে যাচ্ছে। ওঠ্‌ শালা, ঘুম ছুটিয়ে দেব এক থাপ্‌পড়ে।

রোগাটে লিক্‌লিকে পাকাটির মত লোকটা চোখ কচ্‌লে উঠে বসলো, অ মাইরি হুটুদা, ঘুম পেয়ে গেছলো। সারাটা দিন যা—

—থাম্‌ শালা, ব্যাড়ব্যাড়ানি ভাল লাগচে না। একটু নেশার জোগাড় দেখ দিকি। বানা দিকি এক ছিলিম, খাই জুৎ করে।

জেলে ব্যবস্থা থাকে শুনেছি, লক্‌-আপেও সব কিছু পাওয়া যায় জানতাম না। ভাবলাম সিপাহীটার সংগে ভাব জমাবে এবার। যা দেখলাম তা আরো তাজ্জব ব্যাপার। পাকাটিখানা আমের গুঁড়ির পিঠে উঠে দাঁড়াল। তার ওপরে উঠে সেই ছেলেটা ঘুলঘুলি থেকে বার করল একটা ছোট্ট কলকে, দিশলাই আর একটুকরো ন্যাকড়ায় জড়ানো শুক্‌নো পাতার মত জিনিষ। গাঁজা না চরস্‌ ঠিক বুঝলাম না।

ছিলিম সাজা হলো। কোণে যারা শীতে গুঁড়িশুড়ি হয়ে বসে ছিল তারাও আমার মত সন্ত্রস্ত চোখে প্রতীক্ষা করতে লাগলো কখন সিপাইটা এসে ধমক লাগায়।

সিপাইটা একবার ঘুরে গেল, কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ করলো না। হুটু কলকে-শুদ্ধ মুখটা কম্বলের আড়ালে ঢেকে ফেললো। মিনিট দুই পরে আরাম করে সুখটান ছেড়ে শান্ত হলো লোকটা। হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, কী মশাই, চলবে?

হাত জোড় করে রেহাই চাইলাম।

—না? সে আমি জানি মশাই। ভদ্দরলোক আপনারা। এসব ছোট

জিনিষ। তা আপনাদের জন্যে যা ব্যবস্থা সে তো এখানে নেই মশাই। কী করবো বলুন। বোতল-ফোতল বড় হাঙ্গামা। রাখ্‌বো কোথায়? টের পেলে বড়বাবু ভূত ছুটিয়ে দেবে। তা বিড়িসিগ্রেট? —এই মদনা, আছে দু'একটা? ছাড় না, বাবা।

ঘাড় নেড়ে বললাম, খাই না।

—ও বাবা সাবিত্রী একেবারে।

আপ্যায়ন করতে না পেরে লোকটা বোধ হয় চটে গেল। বাঁকা চোখে তাকিয়ে বললে, তা মুখটা তোলো চাঁদ একবার, দেখি।

ততক্ষণে ছিলিমটা আরো তিন হাত ঘুরছে। দ্বিতীয় কম্বলের লোকগুলোও উঠে বসেছে প্রত্যাশায়। একজন বলে উঠল, তা যা বলেছিস নোটা, শাড়ী পরিয়ে দিলে—

নোটা বা হুটু সমর্থন করলো, বেড়ে বলেছিস্ পদা। তখন থেকে ভাদর-বৌ আমার মুখ ঘুরিয়েই বসে আছে। তা হ্যাঁ বাবা ভাদরবৌ, কেসটা কি? নতুন যে, সে তো বুঝতেই পারছি। তা তুমিও কি বাবা, ওই পেঁচিটার মত রাস্তায় হল্লা করছিলে? উঁহু, চোখ দেখে তো মনে হচ্ছে না, কিরে পদা—

—নাঃ।

—তবে মুখ খোল না চাঁদু, মেয়েছেলে-টেলে ভাগিয়েছ? না মোটা কিছু হাতিয়েছ? হ্যাঁ, কেসটা কী? ও লজ্জা হচ্ছে? তা লজ্জার কিছু নেই। আমরা সব ভাইভাই বেরাদার। আমার নাম নোটা সদ্দার। কলাকার স্ট্রিটে বড়তলা সোনাপটি অঞ্চলে, মানে দু তিনটে কেসে আমাকে যাওয়া-আসা করতে হয় মাঝে মাঝে। শ্রীঘর? তা বার তিনেক হবে, না কি রে পদা?

পদা ঘাড় নাড়লো, তা কমাচ্ছিস্ কেন নোটা? তোরও কি ভদ্দরনোক হবার সখ হোলো নাকি? তিন কি রে, চার হোল না?

নোটা হাসলো, শোনো তবে। ওর হ'লো দু'বার। আর এই যে মদনা, দেখতে পাকাটি। কিন্তু হাতখানা সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখার মত। বাকী যারা আছে এরা সব চুনো-পুঁটি। আর ওই পেঁচি মাতালটা—তা সে যাগ্‌গে, তোমার কেস্‌টি বেরাদার বললে না তো? মেয়েছেলে?

মুখ খুলতে হ'লো এবার। এখনো দু'ঘণ্টা রাত রয়েছে। ওদের সঙ্গেই কাটাতে হবে সময়টা। হাসি ফুটিয়ে বললাম, না ওসব কিছু নয়।

—তবে স্বদেশী? মানে বোমা-পিস্তল? চমকে উঠলো নোটা সদ্দার। গান্ধী মহারাজের চেলা আপনি? বোমা ছুঁড়েছিলেন?

ওদের চোখে বোমা, পিস্তল, গান্ধী মহারাজ, স্বদেশী, কংগ্রেস সব এক। তা হোক, ওদের শ্রদ্ধা দেখে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছি ততক্ষণে। হেসে বললাম, পুলিশের ধারণা আমি দলে আছি।

সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশটা বদলে গেল। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে একটু সরে বসল ওরা। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর সুরে সম্ভ্রম এনে নোটা বলল, তা এখানে বাবু? আপনাদের তো আলাদা—

—হ্যাঁ, কাল যেতে হবে সেখানে। আজ রাতের মত আমি আপনাদের বড়বাবুর অতিথি।

সেই ছেলেটা অর্থাৎ মদনা বলে উঠল, যা পেঁদাবে না। না নুটুদা?

—থাম্ তুই কি করে জানলি? নোটা ধমক দিল।

—শুনিচি। সেবার জেলে গিয়ে একটা বাবুর যা হাল করেছিল দেখলাম, ওরে বাবা আমি হলে—

—থাম্ উল্লুক। আবার? ধমক দিল নোটা। তারপর আমাকে বললো, কিছু মনে করবেন না। আমাদের স্বভাবটা এমনি বাবু। চোর-ছ্যাচোড়ের সঙ্গে মিশে মিশে ভুলে গিয়েছি দুনিয়ায় ভাল লোকও আছে দু' চারটে।

একটা কম্বল ওরা পরম স্নেহে জড়িয়ে দিল আমার গায়ে। তারপর চুপি চুপি নোটা বলল, ভাববেন না বাবু। বোমা যখন পায়নি, তখন বেশী কিছু হবে না। আলিপুরে যদি পাঠায় তো আমার নাম বলবেন, কিছু অসুবিধা হবে না আপনার। আমি অবশ্য খবর পাব।

রাত্রিটা গল্পে গল্পে কেটে গেল। প্রধান বক্তা আমিই।

সকালবেলায় যখন আমার ডাক পড়ল তখন নোটা হাত দুটো ধরল—কিছু ভাববেন না বাবু। আমাকে আটকাতে সময় নেবে। জামিন আমার বাঁধা আছে। তারপর সে দেখা যাবে। আপনার মায়ের ভার আমার ওপর রইল। আপনারা সবার জন্যে করবেন, আমি এইটুকু পারবো না?

মদন হঠাৎ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো! —ব্যাটাদের তাড়াতে পারবেন তো বাবু? মেলা আছে আপনাদের ফটাফট—তা আমাকে একটা যদি দিতে পারতেন বাবু, আমিও দেখতাম তা হলে।

নোটা তার কথা রেখেছিল। মদনকে পাঠিয়ে মায়ের খোঁজ খবর নিত।

তারপর নোটা বা মদনের সঙ্গে আমার আর দেখা হয়নি। আমি জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার মাস তিনেক আগে থেকেই ওরা নিপাত্তা হয়ে গিয়েছিল। ওদের কথা প্রায়ই মনে পড়ত প্রথম প্রথম, মা'ও খোঁজ নিতে বলত। কিন্তু ওদের ঠিকানা জানতাম না, কোথায় কার কাছে খোঁজ নেব ?

তারপর মা মারা গেছেন, জীবনের নানা আবর্তে জড়িয়ে পড়েছি। সংসারী হয়েছি, আর সংসারের জন্য ব্যবসাটাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে। ওদের কথা মন থেকে মুছে গেছে।

কিন্তু হঠাৎ ধূমকেতুর মত মদন আবার আবির্ভূত হল পঁচিশ বছর পরে।

পার্ক স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে গুরুসদয় রোড দিয়ে গড়িয়াহাটার দিকে চলেছে গাড়িটা। একখানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়ালো ঠিক একটু আগে ট্যারচা করে। আমাদের গাড়ীটাকেও থামতে হ'লো। ব্রেক কষে ড্রাইভারটা গালাগালি দিয়ে উঠলো—কী হে, ক'দিন গাড়ী চালাচ্ছ? সামনে এসে বলা-কওয়া নেই—

—দাঁড়াও। সামনের গাড়ীটা থেকে সুবেশ বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক নেমে এগিয়ে এলো: অনেকক্ষণ ধরে ফলো করছি। চলুন থানায় যেতে হবে।

স্তম্ভিত হয়ে বললাম, তার মানে ?

—মানে ? লোকটা হাসলো। মানে এখনো বুঝতে পারেননি ? আমি পুলিশের লোক।

—কেন ? কী ব্যাপার ? কী করেছি আমি ?

অর্চনার দিকে ইঙ্গিত করে লোকটা বললো, উনি তো আপনার স্ত্রী নন নিশ্চয়ই।

বললাম, না।

—আপনি ড্রিঙ্ক করেছেন, ঠিক কিনা ?

—করেছি একটু, কিন্তু মাতলামি করিনি রাস্তায়।

—তা করেননি। কিন্তু ট্যাক্সির ভিতরে যা করছিলেন—

—কী বলছেন যা তা ? কিছুই করিনি আমি।

—যা বলবার থানায় গিয়ে বলবেন, মশাই। চলুন। এই ড্রাইভার—

সর্বনাশ ! অর্চনাকে নিয়ে থানায় ! কলকাতা শহরে আমাকে অনেকেই

চেনে। আর অর্চনাকে না চিনলেও ওদের পরিবারের নাম অনেকেরই জানা। খবরের কাগজে যদি একবার নাম বের হয়, কেলেঙ্কারীর অন্ত থাকবে না। বন্ধু-বান্ধবের কথা বাদ দিলাম, সুজাতা, ছেলে-মেয়েদের কাছে মুখ দেখাব কী করে!

লোকটা ততক্ষণে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে ড্রাইভারের পাশে বসেছে। হুকুম দিয়েছে, গাড়ী ঘোড়াও, লালবাজার যেতে হবে।

বললাম, দেখুন, উনি এক বিখ্যাত পরিবারের মেয়ে, তা ছাড়া আমাকেও লোকে চেনে। সত্যি বলছি আমরা কিছুই করিনি। একটা পার্টি ছিল। দেরী হয়ে গেল। ওঁর গাড়ী নেই তাই যোধপুর পার্কে, ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাচ্ছি। ওঁর স্বামী, মানে আমার বন্ধু, কলকাতায় নেই তো। আসলে উনি আমার বোনের মত—

লোকটা সিগারেট ধরাল একটা। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, বোনের সঙ্গে ড্রিঙ্ক করে কেউ রাত বারোটার সময় হাওয়া খেতে বার হয় না মশাই। ওসব বাকতাল্লা আমার কাছে দেবেন না। সব বুঝি আমরা। আপার সোসাইটির লোক মশায় আপনারা। কী আর বলবো, বাড়তি স্ফূর্তি করতে গেলে মাঝে মাঝে খেসারৎ দিতে হয় বৈকি।

হঠাৎ চকিতে যেন আশার আলো দেখতে পেলাম। বললাম, দেখুন থানায় নিয়ে গেলে আমার ক্ষতি, আপনারও কোন লাভ নেই। তার চেয়ে বরং কত হ'লে আমাকে ছেড়ে দেবেন, বলুন।

লোকটা যেন কী চিন্তা করল। তারপর বলল, বড় সমস্যায় ফেললেন মশায়, ডিউটি এদিকে, আর ওদিকে আপনার, ওঁর সুনাম। ভদ্রঘরের ব্যাপার। ঠিক আছে, তা কত দিতে পারেন আপনি?

আমাদের দু'জনের পার্স থেকে আটচল্লিশ টাকা বের হ'লো। চার খানা নোট এগিয়ে দিলাম, লোকটা শুধোল কত?

—আটচল্লিশ আছে মোট। আপনি চল্লিশ টাকা নিন, ট্যাক্সিভাড়া দিতে হবে তো, তাই।

—চল্লিশ! ফুঃ, ওতে কি হবে মশাই। এই ড্রাইভার, কী হ'চ্ছে, জোরে চালাও।

অর্চনা আরো ভয় পেয়ে গেল। ডান হাতে বালা ছিল একগাছা, সেটা আমার হাতে গুঁজে দিল।

টাকাটার সংগে বালাটা এগিয়ে দিলাম, আর তো টাকা নেই, এইটা যদি—

মুখ ফেরালো এবার লোকটা। পেছন থেকে একটা গাড়ীর হেডলাইট এসে পড়েছিল, বালাটা দেখতে দেখতে বললো, গিল্‌টি ফিল্‌টি নয় তো দাদা? না, তা ভালই মনে হচ্ছে।

হঠাৎ মনে হ'লো, লোকটা যেন চেনা-চেনা। লম্বাটে মুখ, কানের কাছে একটা মোটা জরুল, কপালের ওপর তেরচা কাটা দাগ।

অস্ফুট স্বরে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মদন নয় তো।'

লোকটা চট করে বালাটা পকেটে ফেলে বলে উঠলো, এই, গাড়ী থামাও।

ভিতরের আলোটা হঠাৎ জ্বালিয়ে দিলাম অর্চনার হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে। গাড়ীটা থেমে গেল ব্রেক কষে। ততক্ষণে চিনতে পেরেছি মদনকে। হাতটা চেপে ধরলাম, দাঁড়াও। আমাকে চিনতে পেরেছ মদন?

মদন হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না। বলল, কে আপনি? বিস্মিত চোখে বেশ কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, হ্যাঁ, পেরেছি এবার। আপনি তো সেই স্বদেশী বাবু, অনেক দিন আগে একবার থানা হাজতে দেখা হয়েছিল, নয়?

বললাম, হ্যাঁ। চিনতে পেরেছ তাহ'লে? পুলিশ যে নও তা পালাবার চেষ্টা করতেই বুঝতে পেরেছি। আজকাল তুমি এইসব করছ? ছি-ছি। রাস্তাঘাটে ভদ্রলোকদের ধরে এভাবে, ছি—ছি—ছি—

মদন একটু লজ্জা পেয়েছে মনে হ'ল। বলল, কি করবো বাবু? পকেট মেরে কি আর দিন চলে আজকাল? কী করি, বলুন। বিয়ে-থা করেছি, ছেলে-পুলে আছে, নোটাদাও বুড়ো হ'য়েছে, তাকেও খাওয়াতে হয়তো।

—কেন? একটা চাকরী-বাকরী করতে পার না?

মদন বলল—চেষ্টা করেছিলাম, লেখাপড়াও একটু শিখেছিলাম, ভবতোষ-বাবু। তা আমাকে কে আর চাকরী দেবে? একটা বড় দাঁও পেয়ে ছোট দোকানও করেছিলাম—কিন্তু পুলিশের তা সহ্য হল না। আমরা ভাল হব কি করে? আমরা তো দাগী।

—তাই বলে এইসব করবে? ছি, ছি, মদন। তুমি না একদিন স্বদেশী করতে চেয়েছিলে?

মদনের চোখটা জ্বলে উঠলো হঠাৎ।—আমি চেয়েছিলাম আর আপনি

তো করেছিলেন, জেলে গিয়েছিলেন। ইংরেজও তো তাড়িয়েছেন। তারপর এখন কি করছেন? এই তো মাল টেনে মেয়েছেলে নিয়ে স্ফূর্তি করে বেড়াচ্ছেন। ইংরেজ তাড়িয়ে সব শালা—যাক্ গে, দেরী হয়ে যাচ্ছে। গলার হারটা খুলে দিন, দিদিমণি। অনেক হ'বে আবার।

মদনের চোখে নোটার সেই প্রথম দেখা ব্যঙ্গ মেশানো দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে এবার শুধু অবজ্ঞা নয় তার সঙ্গে মিশে রয়েছে ঘৃণা আর ধিক্কার। শিউরে উঠে মাথা নীচু করলাম। অর্চনা হারটা খুলে দিল।

রাহু

মৌগঞ্জে যিনি সাইকেল রিক্সার পত্তন করেছিলেন সেই বিপিন চক্রবর্তী বছর দুয়েক না যেতেই রিক্সা তিনখানা বেচে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিলেন।

রিক্সা চড়ার লোকজন ক'টাই বা ছিল তখন। শনি-রবিবার ছুটির দিন কলকাতা থেকে বাবুরা এলে গেলে রিক্সার দরকার মতো। রোদে জলে পড়ে থেকে থেকে আর চলার সময় কাঁচা রাস্তায় খানাখন্দে পড়ে পরের বছর শেষ না হতেই চক্রবর্তীর রিক্সা ক'টা ঝরঝরে হয়ে ব্যবসা লাটে ওঠার অবস্থা হলো। তার মাস ছয়েক পরে জলের দরে ওগুলো প্রায় দয়া করেই কিনে নিলেন রামরঞ্জন মিত্তির। এ অঞ্চলে রামরতনের গদীটা বড়ই। আরও বাড়াবার ইচ্ছা আছে। দূরদর্শী ব্যবসায়ী বুঝতে পেরেছিলেন আর বছর দুয়েকের মধ্যে অবস্থা ফিরতে সুরু করবে। তখন রিক্সার কদর হবে। হয়েছেও।

হবে বৈকি ? রাস্তায় পীচ হয়েছে। লোকজনও বেড়েছে। আরো বাড়ছে। গঞ্জ থেকে ক্রমে ক্রমে পুরোপুরি শহরের মর্য্যাদা পায়নি এখনও। তবে বেশী দেরীও নেই বোধ হয়। মাঠের মাঝখানে হল্টটা এখন উঁচু প্ল্যাটফর্মওয়ালা ষ্টেশনে পরিণত হয়েছে, যাত্রীশেড তৈরী হয়েছে একটা। গঙ্গার ধারের বাজারটা ক্রমশঃ ষ্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ও রাস্তাটাও পাকা হয়েছে। মাঝামাঝি একটা সিনেমা হাউস খুলে গিয়েছে। পঞ্চাশ ফুট একটা হাইওয়ে চলে গিয়েছে ষ্টেশনের ও পাশ দিয়ে। ইলেকট্রিসিটি ইচ্ছে করলেই অর্থাৎ টাকা খরচ করার সামর্থ্য থাকলেই পাওয়া যায়। দু একজন ধনী ব্যবসায়ীর গদীতে ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে। রামরতনও আনিয়েছেন।

বসতি বাড়ছে, ব্যবসা বাড়ছে, লোকজনের যাতায়াত বাড়ছে। তার উপর কিছু কিছু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু আসতে শুরু করেছে। মৌগঞ্জের শহর হতে আর দেরী নেই।

রিক্সার সংখ্যাও বেড়েছে বৈকি। রামরতনেরই দশখানা। তবে অন্য ব্যবসার তুলনায় আয়টা ঠিক মনোমত হচ্ছে না। দশখানায় দশ দুগুণে কুড়ি টাকা দৈনিক। অর্থাৎ মাসে ছ'শো টাকা। রেট্ বাড়াবার খুবই ইচ্ছে

আছে। বিপিন আর ক্ষুদিরাম রাজী, কিন্তু জগো কুণ্ডু যেরকম রেষারেষি চালিয়েছে তাতে সে পথ বন্ধ। জগোর পুঁজি কম, খাঁইও কম, নতুন ব্যবসায় নেমেছে ওর যথাসর্বস্ব ঢেলে। কিন্তু বোকাপড়ায় অর্থাৎ রামরতনের. পরামর্শে কান পাততে চাইছে না। নতুন গাড়ীর রেটও ওই দু'টাকা করে রেখেছে। রামরতনের লোকেরা মার খাচ্ছে। কুড়িখানা গাড়ী কি রাতদিন চলতে পারে এইটুকু মফঃস্বল শহরে? রামরতনের লোকেরা রেটের টাকাটা এখনো দিয়ে যাচ্ছে। তবে ঝগড়া-বিবাদ প্রায়ই হচ্ছে। হয় নতুন গাড়ী দাও, নয়তো রেট্ কমাও। পালের গোদা ওই রাংতা আর লেটো। বলে, চার হাজার খাটিয়ে সুদ খাচ্ছেন মশায় ছ'শো টাকা। আর কত লেবেন? মনে হয় ধাঁই করে একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেন বেটার গালে। তা সাহস হয় না। দিনকাল সুবিধের নয়। তা'ছাড়া, লেটো-রাংতার বাকী বকেয়া থাকে না। যেমন করে হোক্, রেটের টাকাটা উশুল দেয় ঠিক।

জগো কুণ্ডুকে কেমন করে শায়েস্তা করা যায় সেই কথাই ভাবছিলেন রামরতন এমন সময় রাংতার গাড়ী ফিরল। ধপ্ করে বসে পড়ে ঘাম মুছতে মুছতে বললো, আর চলে না মশায়। সারাদিন হাপিত্যেশ করে বসে বসে খেটে খুটে তিন টাকা কামাই। তার মধ্যে আবার চার আনা সারাই খরচা বেরিয়ে গেল। তা আমরাই বা খাবো কি আর আপনাকেই বা দেবো কি? এর একটা বেবস্তা করেন মিস্তির মশাই।

প্রস্তাবটা শুনে খিঁচিয়ে উঠলেন রামরতন,—বেবস্তা! বেবস্ত' কী করব রে হারামজাদা! দেখচিস্ না, দিনকাল কী পড়েছে? আমি মরছি নিজের জ্বালায়—উনি এলেন দু'টাকা দিতে পারবো না মশাই! না পারিস, ছেড়ে দে গাড়ী। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব? যত সব নেমকহারাম—

মানে জানুক আর না জানুক কথাটা শুনে রাগ চড়ে গেল রাংতার। ফুঁসে উঠল—খবদ্দার মশায়, যা তা গালাগাল দেবেন না বলে দিচ্ছি—হ্যাঁ।

ফেলা আর তিনে এসে গদীতে ঢুকেছিল ইতিমধ্যে। ওদের সামনে রাংতার ধমকটা সহ্য হলো না। জ্বলে উঠে বললেন—কেনে, মারবি নাকি? কি করবি কি? নবাবপুত্তুর আমার, গায়ে ফোস্কা পড়ে একটা কথা বললে।

রাংতার রাগলে হ্রস্বদীর্ঘ জ্ঞান থাকে না। তেমনি সুরেই জবাব দিল, চাইলে, আমিও গালাগালি দিই খানিকটা, দেখেন?

রামরতনের যা ইচ্ছে হয়েছিল ওদের তিন মূর্তির দিকে তাকিয়ে সেটা সংযত করলেন। ফেলাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—হ্যাঁরে, তুই তো শুনলি, আমি গালাগাল দিলাম ওকে? মনের দুঃখে একটা কথা বললাম, তা বাবুর অমনি গোঁসা হলো।

ফেলা বললো—তা বাপু, রাংতা একটু রগচটা আছে। সারাদিন ওজগার-পাতি হয়নি, পেটে ভাত নেই, মেজাজ ঠিক থাকবে ক্যামনে?

রাংতা দপ্ করে জ্বলে উঠে আবার নিভে যায় পরের মুহূর্তে। গুম্ হয়ে বসেছিল। তাকে উদ্দেশ করেই রামরতন বললেন—যা যা, বাড়ী যা সব। খেটেখুটে এলি, চান্ করে খা-গা। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দেখিস্। অন্যায় আমি কিছু বলিনি তোকে। নিজের লোক বলে দু' একটা ধমক-ধামক দিই। যা বাড়ী যা! আজ না দিতে পারিস্, থাক্। কাল-পরশু দিস্! এর আর কথা কি আছে।

রাংতা বললো—না বাবু, কাল-পরশু আবার কোতা পাব? যেদিনকার যা, তাই ভাল।

নোট আর খুচরো মিলিয়ে দুটো টাকাই দিয়ে দিল রাংতা।

ফেলা আর তিনের আগেরও কিছু কিছু বাকী আছে, ওরা আট আনা করে কমই দিল। শনি-রবিবার পুষিয়ে দেবে।

বাকী ক'জনও এসে জুটলো। টাকা-পয়সা হিসেব নিকেশের পর রামরতন বললেন—তোরা যদি বেকুব হস্ তো আমাকে তো ব্যবসা তুলে দিতে হবে। বুঝেসুঝে চল। তোদেরও হোক, এ আর কে না চায়। ভেবে দেখ, ব্যবসা যদি বন্ধ হয়ে যায় আমার দু'মুঠো জুটে যাবে কোন রকম করে। কিন্তু তোদের গতিটা কি হবে? তখন তোকে চাকরী না দিলে তোর হালটা কী হতো, একবার ভেবে দেখেছিস্? কি রে রাংতা, মাগ-ছেলে নিয়ে কি খেতিস্ তখন তুই?

রাংতা ঘাড় নাড়ালো, তা মিথ্যেকথা বলবো না বাবু—তখন আপনি বাঁচিয়েছিলেন।

—তবে! তাই বুঝি এখন তম্বি করছিস্ আমার ওপর?

অন্নদাতা উপকারী মনিবের ওপর চোখ রাঙিয়ে এখন খারাপ লাগছিল রাংতার। মাথা চুলকে বলল, কথা যথার্থ বাবু। কিন্তুক বৌ-ছেলের মুখের দিকে চাইলে মাথা গোলমাল হয়ে যায়। বৌটোর ছেঁড়া তেনা, আমার এই

প্যাণ্ট—তা সে যাক্। কালও আধপেটা, আজ আবার সিকি পেটা। বারো আনা পয়সায় কি হবে আপনিই বলেন ?

—ওরে বেটা, দিন কাল কি পড়েছে দেখ্। ভদ্রলোকের ঘরেও যে ছুঁচোর কেত্তন। যাও বা জুটচে তোর, তাও 'যে বন্ধ হবে ব্যবসাটা উঠে গেলে—তখন ? আয় না হলে আমি কি চালাতে পারব ?

—হ্যাঁ, সে কথা সত্যি বটে। আটটা মাথা একসঙ্গে নড়ে উঠলো।

এরকম করে যে বেশীদিন চলবে না সে কথা বুঝতে পেরেছিলেন রামরতন। এক-একবার ভাবছিলেন, ঝাঁপিয়ে পড়ি। হেস্তনেস্ত হয়ে যাক্ একটা। আবার ভয়ও করছিল। অথচ জগোর দাঁত ভাঙতে হলে এ ছাড়া আর উপায় নেই।

ক'দিন পরে সব কটাকে একসঙ্গে আসতে দেখে ভ্রূ কোঁচকালেন রামরতন। মানে, আবার একটা ঝগড়া।

—কি রে, ব্যাপার কি সব ? দল বেঁধে যে ? —ডাকাতি করতে বেরিয়েছিস্ নাকি !

কেউ কোন জবাব দিল না। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল শুধু। রামরতন ওদের ভাবগতিক দেখে একটু ঘাবড়ে গেলেন। গদীতে এখন বুড়ো চাকরটা ছাড়া আর কেউ নেই। সুর পাল্টে বললেন—সকাল সকাল এসেছিস্ সব, ভালই হলো। আমিও ভাবছিলাম—তা রোজগারপাতি কেমন সব ? ভালো ?

—আর ভাল—মাশায় !

দু'টাকার খুচরো গুণে দিয়ে বাকী আট আনা দেখালো লেটো। এই রইল। তা 'পর মরো বাঁচো। বুজলেন ?

রামরতন খুচরোটা বাক্সে ফেলে বললেন, কেন ? তোর আবার হলো কি—গাড়ী ভেঙেছিলি ?

—না মাশায় না। লেটো অমন গাড়ী ভাঙবার পাত্তর নয়। ইদিক-উদিক একটু-আধটু নিজেই ঠিক করে নিই।

—তবে আবার কি হলো ? পুলিশে— ?

—যাঃ গেল, সে আমাদের বেপার মাশায়, সে আমরা বুঝব। ওই যে কী বলছিলাম। কী বলতে চেয়েছিল তা ভুলে গিয়েছে লেটো। মাথা চুলকে

রাংতার দিকে তাকাল।

রাংতা ভেবেছিল কথাটা আজ লেটোকে দিয়েই তোলাবে। এতক্ষণ তালিম দিয়ে নিয়ে এসেও লেটো ধানাই-পানাই করছে দেখে, নিজেই এবার বলল, ওই যে সেদিন বলছিলাম, সেই কথাটা বড়বাবু। রেটটা না কমালে আর পারা যেচে না।

হাঁ, হাঁ করে উঠলো লেটো। মনে পড়েছে এবার। বলল, রেটটা মাশায় কমাতে হচ্ছে। তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা রোজগার। তা দু'টাকা আপনাকে দিলে কেরাচিন তেল, সারাই তা'পরে পুলিশ—পেটটা তো মানে না মাশায়।

রামরতন ওদের মুখের উপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর কলমের উল্টোপিঠটা দিয়ে একটা বাজে কাগজের ওপর দাগ কাটতে লাগলেন। ওরা চুপ করে রইল। বুঝল মিস্তির মশায় ভাবছেন। উপায় ঠাওরাচ্ছেন।

মিনিট পাঁচেক পরে মাথা তুললেন রামরতন। —উপায় একটা আছে। সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। তা সে কি তোরা পারবি ?

—কেনে ? বলেন না কেনে। পারব না কেনে ? এবার তিনের গলাটাই সব চেয়ে উঁচু। কারণ ওর গলাটা উৎসাহের সময় বেশ জোর হয়ে ওঠে।

—কিরে তোরা কী বলছিস ? রামরতন রাংতার মুখের দিকে তাকালেন।

—ভালা মুস্কিল বটে। কী করতে হবে বলেন আগে।

রামরতন বললেন—তোদেরও রোজগার বেশী চাই, আমরাও রোজ বেশী চাই। এই তো ? তা এক কাজ করলে তো হয়। ভাড়ার রেটটাই তোরা বাড়িয়ে দে না কেন ?

মাথামোটা তিনে উৎসাহে উঁচু হয়ে বসল, আঁ, তা সে তো, না পারার কী আছে মাশায়। আপনি হুকুম করলেই হয়।

রাংতা এক ধমক মারল।—থাম দেখি তুই। অতো সোজা। সবাই বেশী ভাড়া দেবার জন্যে বসে আছে। এমনিই পুরোনো নিতে চায় না—

রামরতন হাত তুলে থামালেন রাংতাকে।—শোন্ শোন্ আগে। হাঁ হাঁ করিস না সব তাতে। আমি বলছি দেবে—না দিয়ে যাবে কোথা ? তোরা সবাই মিলে জোট হলেই হবে।

—তা হয় না মাশায়। আমি না গেলে আর একজন যাবে—আমরা না

গেলে ওরা যাবে।

—ওরা মানে কুণ্ডুর গাড়ী তো? তা সেই কথাই তো বলছি। ওদের সঙ্গে সাট কর না কেনে।

যতে বলল, সাট কী করে হবে মাশায়? ওদের গাড়ী লতুন ঝকঝকে। সোমান ভাড়া বল্লে ওদের গাড়ীই লোকে আগে নেয়। আমরা বাড়ালে ওদের কচুটা। ওরা বাড়াবে না। কুণ্ডুবাবু বলে দিয়েছে।

আর একটু ভাবলেন মিত্তির মশাই। তারপর বললেন—তবে কমিয়েই দে তোরা। কম হলে লোকে তোদের গাড়ীই নেবে।

লেটো বলল, তা'পরে? রেট্ দেব কোত্থেকে মাশায় আপনার? পরতায় কুলোবে? ও সবে নেই মাশায় আমরা।

মুরুখ্যুগুলোর মাথায় যদি কিছু থাকে। ধৈর্যচ্যুতি হ'লো রামরতনের—তবে মর গা যা। গাড়ী ছেড়ে দে। তালা বন্ধ করে রেখে দেব। এ এক মহা ঝামেলা?

আশ্চর্যের কথা, এই মোক্ষম অস্ত্রেও কাজ হলো না আজ। রাংতা জবাব দিল, তাই দেব বাবু। তাই দেব। পেট না চললে গাড়ী চালাব কী করে? কুণ্ডুবাবু লতুন গাড়ী কিনবে বলছে তা ওখেনেই চালাব।

তা পারে এ ব্যাটা। একটি পয়সা বাকী রাখে না। রামরতন হঠাৎ সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেললেন—ঠিক আছে। তোদের কথাই রইল। এক-টাকা করেই দিস তোরা—হল তো। চালা তোরা কম্পিটিশন। দেখি কুণ্ডুর তেল মারতে পারি কিনা।

ওরা হাঁ হয়ে গেল। দু টাকা থেকে ঝপ করে এক টাকা। মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি মিত্তির মশায়ের?

রামরতন বুঝলেন ওরা বিশ্বাস করতে পারছে না। বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, এক টাকা করেই দিবি আপাততঃ। তারপর সে দেখা যাবে। কিন্তু কুণ্ডুর গাড়ী কোণ-ঠাসা করা চাই—বুঝলি সব?

আনন্দে কেঁদে ফেলল যতে, লেটো, রাংতা আর পটলা। ফেলা কী করবে ভেবে না পেয়ে মিত্তির মশায়ের পা দুটো জড়িয়ে ধরে গড় করল একটা। তিনে চেঁচিয়ে উঠল, মিত্তির মাশায় কি জয়!

জয়ধ্বনিটা রামরতনের মনে খুশীর একটা ঢেউ তুললো। বললেন, কি রে, এবার পারবি তো সব?

গদ্‌গদ কণ্ঠে রাংতা বলল, নিশ্চয়। আপনার আশীর্ব্বাদে কুণ্ডুর বেবসা ঘুচিয়ে দিচি, দেকেন কেমে।

রামরতনের কোঁচকানো মুখটা হাসিতে সুপ্রসন্ন হয়ে উঠল। —তা যদি পারিস রাংতা, তো তোদের এই দশজনের প্রত্যেকের নতুন গাড়ী সামনের বছর। এই কথা রইল।

ফেলা বলল, আর পুরণোগুলো ?

—থাকবে। ওগুলোও থাকবে। লোক দেখে রাখ।

ওরা হৈ হৈ করতে করতে অকারণে ট্রিং ট্রিং আওয়াজ দিতে দিতে দল বেঁধে বেরিয়ে গেল নতুন উৎসাহ নিয়ে। আজ থেকেই এক টাকা করে দিয়েছেন মিত্তির মশায়। পেট ভরে কাল খাবে সবাই।

গদী বন্ধ করে বাইরে এলেন রামরতন। কত রিক্সা লাগবে আরো। বাড়ছে, লোক বাড়ছে। রেটও বাড়বে। ক'টা মাস যাক। কুণ্ডুকে হাটাই। তারপর। আপন মনে হেসে উঠলেন মিত্তির মশায়।

এ ঘটনা এখনকার নয়, ছ বছর পূর্বের। এখন যদি আপনি মৌগঞ্জে যান, চিনতে কষ্ট হবে। ষ্টেশনের ধার থেকে বাজার পর্যন্ত পীচবাঁধানো রাস্তার দু'পাশে নতুন নতুন দোকান-পশারের জলুষ। ভঁপ ভঁপ আওয়াজে চমকে উঠবেন আপনি পায়ে হেঁটে চলতে গেলে। তিরিশ পঁয়ত্রিশখানা রিক্সা খাটছে দিনে রাতে। অধিকাংশই নতুন। তবে ভাড়া বেড়ে গিয়েছে দ্বিগুণ। মালিকের রেটও হয়েছে পাঁচ টাকা রোজ।

এদের মধ্যে পটলা তিনে, ফেলা আর যতেকে খুঁজে পাবেন একটু চেষ্টা করলে। কিন্তু রাংতা আর লেটোকে পাবেন না।

ওদের কথা শুধোলে রিক্সাওয়ালারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করবে। ঘাড় নেড়ে বলবে, জানি না।

তবে পুরোনো সেই গঙ্গার ধারের চায়ের দোকানটায় শুধোলে জানতে পারবেন পা-ভাঙ্গা লেটো বিড়ি বাঁধে বলাই শা'র দোকানে। কুণ্ডুর লোকদের সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে পা-খানা খুইয়েছে।

আর রাংতা ?

রামরতন মিত্রের গদীতে হামলা করার অভিযোগে জেল খাটছে রগচটা লোকটা।

হ্যাঁ, রামরতনই এখন মৌগঞ্জের পঁয়ত্রিশখানা রিক্সার মালিক। জগৎ কুণ্ডু এখন আর, সি, ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর ম্যানেজার। রিক্সা ছাড়া টেম্পো করেছেন একখানা রামরতন। শীগ্রি একখানা বাসের লাইসেন্সও পাবেন শোনা যাচ্ছে।

আরো যদি জানতে চান তো একদিন বাদামতলায় চলে যাবেন রাত্রি দশটার পর। দেখতে পাবেন লেটোকে একজন ওই রিক্সাওয়ালারা কেউ ওর বাড়ী পৌঁছে দেবে।

কোন কোন দিন সেই দশটায় রিক্সাটা আর একটু এগিয়ে রাংতার ভাঙ্গা কুঁড়েটা পর্যন্ত যায়। দু-এক টাকা দিয়ে আসে রাংতার বৌটাকে।

ফেরার পথে হয়তো শুনবেন লেটো বলছে, আর একটা বছর চুপ করে থাক তোরা। রাংতা ফিরুক। তারপর দেখা যাবে।

অমৃতের স্বাদ

বসন রাজী হয় না। —ও মা গো, ও আমি মরে গেলেও পারবো নাকো। চেকের নোকগুনো যা করে—

—ঈঃ, যা করে-এ। কেনে বিন্দিরা যায় না? ভেঙাতে গিয়েও রসিকতা করার সাধ যায় যুধিষ্ঠিরের। বলে, সব্বো শরীল টিপে টিপে দেকে, না রে? তা তুই জানলি কী করে? তোকেও দেকেছে বুঝি?

—আমরণ, বসন একটা ঝামটা দেয়। কতার ছিরি দেকো। আমি যাই নিকি কুনোদিন? শুনিচি।

বুকে পিঠে পেটে জড়িয়ে জড়িয়ে চালগুলো বাঁধা হয়ে গিয়েছে। সেগুলো পরখ করে দেখতে দেখতে যুধিষ্ঠির বলে, গেলে ভাল কত্তিস। ভাত ভাত ক'রে হেদিয়ে মরিস, দু'এক মুঠো তবু জুটতো কা'লভদ্রে। মেয়েছেলেদের আধা রেটে ছাড়ে—তেমন তেমন তোর মত হলে মিনি মাগনাতেও—বুজলি?

—অমন ভাতে আমি নাথি মারি। মরণ। ওই ভাত খাবার আগে আমার মুকে যেন পোকা পড়ে। ঝাঁঝিয়ে ওঠে বসন।

মনে মনে খুশী হলেও রাগ দেখিয়ে যুধিষ্ঠির বলে—মর তবে। কুনোদিন যদি ভাতের কতা মুকে এনেছিস, তো ঝেঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব। হ্যাঁ।

তা বসনের অন্যায় বৈকি। জানে যুধিষ্ঠির সারারাত খেটে মহাজনের চাল যথাস্থানে পৌছে দিয়ে যা রোজগার করে, তাতে মডিফায়েড রেশনে ক্বচিৎ কখনো পাওয়া গম ভাঙিয়ে, কি শহর থেকে বেলাকে কিনে আধপেটা খাওয়া জোটে। ভাত একদিন খেতে গেলে ব্যবসা ফেল। অথচ চালের জন্মে মাঝে মাঝে বসন বলে। —হাঁগো একটু দেবে?

বসনের অভিমান হয়, সে কি নিজে কখনো ভাত খাবার বায়না করে নাকি। দু'একবার সখের কথা বলেছে এই মাত্র। তা সে যুধিষ্ঠির আর ভূতোর কথা ভেবেই বলেছে। নইলে সে তো শাকপাতা সেদ্দ খেয়েই পেট ভরায়। প্রথম প্রথম অসুবিধে হতো, তা শরীরকে যা বশ করাবে তাই। এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে।

অভিমান মানেই রাগ। বসন রাগতস্বরে বলে, হঁ্যা, আমিই তো ভাত ভাত করে হেদিয়ে মরচি। কাঁড়ি কাঁড়ি ভাত গিলে ফতুর করে দিচ্চি তোমাকে।

বসন রেগেছে। চোখের কোণে জল টলটল করছে। যুধিষ্ঠিরের মমতা হয়, আহা, কী চেহারা হয়েছে বসনের না খেয়ে খেয়ে। সে কি আর জানে না যে মাসের অর্ধেক দিন বসনের একখানা রুটিও জোটে না? প্রথম দিকে ধান ভেনে ক্ষুদকুঁড়ো কিছু পেত। সে পৌষ মাঘ মাসে, যখন নতুন ধান উঠেছিল। তখন ধান সস্তাও ছিল, কাজও কিছু কিছু মিলতো। মজুরীর টাকায় পৌষ মাঘ মাস, টেনেটুনে ফাগুন মাস পর্যন্ত চলেছে। তারপরেই ব্যাস, ধানচাল যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, টেরই পাওয়া গেল না। হিসেব করতে গেলে শেষ ভাত খেয়েছে ও চৈত্র মাসে।

কিন্তু মেয়েমানুষের কাছে হার মানতে নেই, পেয়ে বসবে অমনি। মনটা টন্ টন্ করে উঠলেও, পিঠ টান করে কুঁজো হয়ে শেষ বারের মত দেখতে দেখতে যুধিষ্ঠির বলে, তবে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আচিস কেনে চালের দিকে লুবিষ্টির মতোন?

—হঁ্যা, আচি। বেশ করচি। চোক দিয়ে গিলে উড়িয়ে দিচি তোমার চাল।

ইতিমধ্যেই বসনের স্বর একটু নরম হয়ে এসেছে। যাত্রার সময় ঝগড়া করতে নেই। কত বাধা বিপদ, আঁধার রাত, সাপ-খোপ আছে রাস্তায়, তারপর সব চেয়ে বড় ভয় পুলিশের। চেকের নোকের রেট বাঁধা। কিন্তু ওদের হাতে পড়লে ওই সোনার চেয়ে দামী চালগুলো কেড়ে নেবে। খেসারত দিতে হবে মহাজনকে। দুগ্‌গা, দুগ্‌গা।

যাবার সময় মিটমাট করে যায় যুধিষ্ঠির এক টুকরো হাসি দিয়ে। সেই হাসিটুকু নিয়ে সারারাত একা কাটাতে হয় বসনকে। আহা, মানুষটা আজ কতো দিন রাতে ঘুমোতে পায়নি।

ভুতো ঘুমের মধ্যে কেঁদে উঠে মা-কে খোঁজে। দরজায় আগড় টেনে তাড়াতাড়ি বসন পাশে এসে শুয়ে পড়ে।

ভাত খাবে! বসনের অতো সখের পরাণ নয়। এখনো একদিনও ধরা পড়েনি যুধিষ্ঠির। মা কালী যদি রক্ষা করেন তবে একটা দরজা লাগাবে সে। যা ভয় করে, মা গো। এই তো একরত্তি ছেলে। হঁ্যা, তারপর ঘর

ছাওয়ানো আছে। গতবার গোঁজাগুঁজি দিয়ে চালিয়েছে—এবার আর না ছাইলেই নয়। আবার কাপড়ও একখানা কেনা দরকার। এই ট্যানা আর কদ্দিন চলবে? কোন্‌দিকে যাবে সে! ভাত? ভাতের মুখে আগুন।

ও মা, একি বলচে সে। দুগ্‌গা দুগ্‌গা, হে মা নখ্যি দোষঘাট নিও না, মা। হে মা কালী, ও যেন ধরা না পড়ে। যেমন করে পারি, তোমায় পুজো দেব মা আলো চালের নৈবিদ্যি দিয়ে। হে মা।

বসন উঠে গিয়ে শূন্য চালের হাঁড়িতে মাথা ঠেকায়, মা কালী দুর্গা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে গড় হয়ে প্রণাম করে।

মা কালী বসনের প্রার্থনা রেখেছেন, আরো পঁনের দিন ভালভাবেই কেটে গেছে। যুধিষ্ঠির ধরা পড়েনি এবং মহাজন ওর কাজে খুশি হয়ে চালের পরিমাণও কিছু বাড়িয়েছেন।

হ্যাঁ, এবার আর দেরী করা নয়। মায়ের পুজোটা দিতেই হবে। ভাল-ভাবেই পুজো দেবে বসন, আলো চালের পুরো নৈবিদ্যি, শশা, কলা, বাতাসা সিঁদুরের থান। কিছু রোজগার সে নিজেও করেছে, সরিয়ে রেখেছে এইজন্যে। ব্যবসা ভাল হচ্ছে দেখে যুধিষ্ঠির আজকাল শহর থেকে গম আটা একটু বেশি করেই আনছে। —তুইও যেন খাস বসন। আগের মত করিস না। চলে যাবে একরকম, ভাবিস না।

একদিন বকাবকি করায় পরের দিন দেখিয়ে দেখিয়ে রুটি খেয়েছে বসন। কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কিছু বাঁচিয়েছে ও। বিক্রি করে একটা টাকা পেয়েছে। কলা, বাতাসা, সিঁদুরের থান, দক্ষিণা হয়ে যাবে ওর মধ্যে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে চাল কোথা পাবে সে? আলো চাল? আটা দিয়ে তো আর নৈবিদ্যি হয় না। মা কালীকে কি আটা দেওয়া যায়? হোক্ না খাবার জিনিষ। কিন্তু আটার নৈবিদ্যির কথা তো শোনেনি কখনো। লুচিভোগ হয় অবশ্য—কিন্তু বাগ্‌দীর মেয়ে তো আর লুচি তৈরি করে ভোগ দিতে পারে না। বামুনের হাতে নইলে পক্ক জিনিষ তো ছোন না মা।

খুবই ভাবনায় পড়েছে বসন। ক'দিন ধরে কোন কূলকিনারা পাচ্ছে না। এর পর দেরী হলে মায়ের মানত রাখতে না পারায় কোন বিপদ না ঘটে।

যুধিষ্ঠির আজকাল একেবারে কিছু চাল এনে রাখে, রোজ রোজ মহাজনের কাছে যায় না। বসনের চালের হাঁড়ি আজকাল আর খালি থাকে না।

সেইদিকে তাকিয়ে দেখে সে আর বুক ফাটে। হায় মা, ঘরে আমার এত চাল, কিন্তু তোমাকে দিতে পারচি না। দোষ নিও না মা, আমার মনে কোন তঞ্চকতা নেই। সুযোগ-সুবিধে পেলেই দেব।

যুধিষ্ঠিরকে বলেছিল একবার। যুধিষ্ঠির মারতে বাকী রেখেছে। তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? ও চাল মহাজনের গোনাগাঁথা ওজন করা। একটি দানা ইদিক-উদিক হলে সব্বোনাশ। খবদ্দার।

বসন বলেছে, না, তা আমি বলছি নাকি। আমি বলছি গতমাসে তো ভালই ব্যবসা হয়েছে। মায়ের কাছে মানত করিচি—পো-টেক আধসের আলো চাল যদি কিনে দিতে।

—কিনে দিতে! ওরে আমার আহ্লাদী রে। বলে ভটচাজ মশাযরা পজ্জন্ত বারোমেসে নিত্যি পুজো বন্ধ করে দিয়েচে চাল আবানে। আর তুই তিন চার টাকা সের চাল কিনে মানত দিবি?

যুধিষ্ঠির ওর আস্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিল।—কে বুদ্ধি দিয়েছে তোকে, কে? ওই শকুনি ভটচাজ? নয়া? শালা বড়ো চালাক। মায়ের নাম করে নৈবিদ্যি বাগিয়ে পেট পুরে খাবে গবাগব।

বসন তাড়াতাড়ি বলেছে, হ্যাঁ, অতো বোকা কিনা আমি। দিচি ওকে চাল? থাকলে আমাদেরই থাকবে। দক্ষিণে দেবো তিরিশ নয়া, সে আমার কতা হয়ে গিয়েচে—

যুধিষ্ঠির বাধা দিয়ে বলেছে—অ, তা'লে তোরই নোলা নকপক করচে? খবদ্দার বলচি, ওসব মতলব ছাড়্। পুজো দিতে হয়, আটা দিয়ে দে গা। তাতে কিছু দোষ নেই। বলে, মধু আবানে গুড়, জানিস না? তা যদি হয়, তো চালের বদলে আটাও চলবে।

লোকটাকে বোঝানো যায় না, বসন যে চালের নৈবিদ্যিই মানত করেছে। চালই দিতে হবে, নইলে পাপ হয়। পুজো হয়, মানত রক্ষে হয় না।

হে মা, আমি কী করি বলে দাও, মা। বসনের চোখে ঘুম নেই, উঠতে বসতে স্বস্তি নেই। মনে হয়, মা বলছেন, দিলি না, দিলি না তো এখনো?

তা মা শেষ পর্যন্ত নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নিলেন।

যুধিষ্ঠির এবার আলো চাল এনেচে সের দশেক। চালগুলো আলাদা হাঁড়িতে রাখতে রাখতে বসনের মনে হলো, মা যেন পরীক্ষা করছেন ওকে। বলছেন,

দিবি না? দিবি না?

দেবে সে। যা হয় হোক। মায়ের কাছে অপরাধী হতে পারবে না।

কোনদিন যা করেনি, স্বামীপুত্রের মঙ্গলের জন্ত তাই করলো বসন। সেই চাল থেকেই একপো খানেক্ চাল সরিয়ে ফেলল সে সকাল বেলা উঠে পুজো পাঠিয়ে দিল। দশ সের থেকে এতটুকু কি আর ধরতে পারবে?

কিন্তু মা বুঝি দেরী হওয়াতে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। চালের নৈবিদ্যির সঙ্গে আরো কিছু দিতে হলো কাঁচাখেকো দেবতাকে।

সেদিন রাতে সেই আলো চালগুলোই নিয়ে বের হল যুধিষ্ঠির। বসন ভেবেছিল যুধিষ্ঠির ভোরবেলা এসে মোষের মত ঘুমোয়, কিছু টের পাবে না। পুজোর চালটা সরিয়ে রাখবে কোথাও, যুধিষ্ঠির যে যে দিন মহাজনের বাড়ী যাবে টাকা জমা দিতে সেই সেইদিন একটু একটু করে ভুতোকে রেঁধে দেবে। ভাতের জন্ত বায়না করে ছেলেটা মাঝে মাঝে। আহা, ওইটুকু ছেলে। বসনেরও তো মায়ের পরাণ, সখ বলেও একটা কথা আছে।

কিন্তু বসনের মনের সাধে বাদ পড়লো! পরের দিন মহাজনের কাছ হয়ে যুধিষ্ঠির ফিরে এলো উগ্রমূর্তি নিয়ে। বসনের চুলের মুঠি ধরে বললো, কী করেছিস তুই? কোতায় রেকেচিস চাল? খুন করে ফেলাবো আজ তোকে, হারামজাদী। পই পই করে বারণ কল্লাম, তবু সেই চুরি কল্লি?

যুধিষ্ঠিরের চেহারা দেখে ভয়ে কোন কথা বলতে পারল না বসন। সেই চুল ধরা অবস্থাতেই ন্যাকড়ায় বাঁধা চালগুলি বার করে দিয়ে হাঁপাতে লাগল।

—পুজো দিবি? য়্যাঁ পুজো দিবি, হারামজাদী? চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকাতে লাগল যুধিষ্ঠির। বল্, কতা বলচিস না, কেন? বল্—

কাঁপতে কাঁপতে বসন বলল, দিইচি। পুজো দিইচি—ও পেসাদী—

—দিইচিস, দিইচিস, হারামজাদী? পুঁটলিটা বাঁ হাতে টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিল যুধিষ্ঠির।—পুজোর নিকুচি করেচে তোর। তোর জন্যে চোর হলাম আমি, লুবিষ্ঠি মাগী—দেকি কোন্ মা বাঁচায় তোকে—

যুধিষ্ঠির এক ঝটকায় খালি হাঁড়িটা তুলে নিয়ে মারলো বসনের মাথায়।

বসন চেঁচাল না। মাথাটা চেপে ধরে ব'সে প'ড়ে বিড় বিড় করে বলতে লাগলো, হে মা, দোষ নিও না মা। রাগলে মানুষের জ্ঞান থাকে না। ওর কোন অমঙ্গল কোরো না মা।

ছড়ানো চালগুলোর ওপর টস টস করে রক্ত পড়ছিল। সেদিকে চোখ

পড়তে হুঁশ হলো যুধিষ্ঠিরের ? পেসাদী চালগুলো পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলেছে সে। বসনের মুখ রক্তে ভাসছে। কাঁপতে কাঁপতে বসে প'ড়ে যুধিষ্ঠির ভাঙা হাঁড়িটার ওপরে মাথা ঠুকতে লাগল, অপরাধ নিও না মা। ঘাট মানছি, হে মা কালী! আমাকে আজ বড্ড অপমান করেছে মহাজন। আমার মাথার ঠিক ছিল না, মা।

যুধিষ্ঠির মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত বের করে ফেললো।—এই নে মা, রক্ত ভালবাসিস তুই, রক্তই দিলাম তোকে। আমার রক্ত ? বৌ-এর রক্ত, পেসন্ন হ' মা।

বসনই ধরে তুললো যুধিষ্ঠিরকে।—ওঠো, মা আমাদের দয়াময়ী, এবার নিশ্চয় দয়া করবে। ওঠো। পেসাদগুলো রক্তে ভিজি গেচে।

দু'জনে মিলে সেই চালগুলি খুঁটে খুঁটে তুলে মাথায় ঠেকালো। প্রসাদী চাল ফেলা যাবে না। মহাপাপ হবে, মা রাগ করবেন।

রক্ত ধুয়ে পরিষ্কার করতে করতে বসনের মনে হলো, না থাক! রক্ত একটু আধটু থাক। মায়ের প্রসাদ। যুধিষ্ঠির ঠিকই বলেছে, মা রক্ত ভালবাসেন বলে এই লীলা দেখিয়ে রক্ত আদায় করে নিয়েছেন।

নিজের আর স্বামীর রক্তমাথা চালের ভাত খাচ্ছে বসন পরম খুশিমনে। মায়ের প্রসাদ।

আজ কোন আপত্তি শোনেনি যুধিষ্ঠির। এক সঙ্গে খেতে বসতে হয়েছে। কত দিন পরে ভাত খাচ্ছে ওরা। যেন অমৃত।

অতিথি

দীনু জানে বড়বাবু স্বপ্ন দেখছিলেন। শুধালো, কাকে ডাকছেন বড়বাবু? আমি দীনু।. কিছু বলছিলেন?

—দীনু? দীনু—ও হ্যাঁ, তুই তো দীনু। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়লো বেণীমাধবের। সে অনেকদিন আগেকার কথা। তখন দীনুর বাবা জগন্নাথ ছিল। ঘোলাটে চোখ দুটো আবার স্তিমিত হয়ে এলো। দিনের বেলাতেও ঝিমোন, স্বপ্ন দেখেন।

এমনি হয়। বড়মা গত হওয়ার পর যখন থেকে দীনুর ওপর দেখাশোনার ভার পড়েছে তখন থেকেই সে লক্ষ্য করছে মাঝে মাঝে সব ভুল হয়ে যায় বড়-বাবুর। মানুষজনের নাম পর্যন্ত সব উল্টোপাল্টা করে ফেলেন। অসুখটার পর থেকে যেন বেড়েছে। দিনের মধ্যে কতবার যে আজকাল মধু, লছমন, ছোটবাবুকে ডাকেন তার আর ইয়ত্তা নেই। আজ আবার ওর বাবার নাম ধরে ডাকছিলেন 'জগো জগো' বলে। নাকি দাদা কালোকে? সব খেয়াল রাখতে হয় দীনুকে, সাড়া দিতে হয়। নইলে কখন কী করে বসেন ঠিক নেই।

কী যেন বলেন আপন মনে বিড়বিড় করে। হাসেন মনে মনে। তখন চুপ করে থাকলেও চলে। কিন্তু কাউকে ডেকে যদি সাড়া না পান তাহলে মুস্কিল। দীনু যদি তখন জাগিয়ে না দেয় তবে একটা কাণ্ড ঘটে যেতে পারে। সেদিন যেমন সাড়া না পেয়ে চেয়ার থেকে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিলেন।

সকাল বিকালটা যা-ও বা একটু আধটু একা রাখা যায়, দুপুর বেলাটা খুবই সতর্ক থাকতে হয়। সন্ধ্যা-বেলায় যখন কালো বাগ্দী, তিনকড়ি ঘোষ, চাটুজ্জে মশায়, সাতকড়ি মিত্তির এরা আসে, তখনও গল্প শুনতে শুনতে কথা বলতে বলতে ঘুমিয়ে পড়েন।

দীনুকে খেয়াল রাখতে হয়। মাথাটা হেলে তাকিয়াটা ঠিক করে দিতে হয়। মনের কথা বুঝে নিতে হয়। কারণ, অনেক সময় বড়বাবু কিছু না বলেও, মনে করেন বলেছেন। উত্তর দিতে হয়, তামাকটা এগিয়ে দিতে হয়।

না দিলে চটে যান। ছেলেমানুষের মত অভিমান করেন। বলা না-বলা, জাগা-ঘুমোনোর কোন তফাৎ নেই বড়বাবুর।

সত্যিই নেই। বেণীমাধবের কাছে অতীত বর্তমানের সীমারেখা বিলীন হয়ে গেছে। সারাদিন মনে মনে শৈশব থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত পরিক্রমা করেন।

বিকাল বেলাটা সব চেয়ে ভাল থাকেন। চৌধুরী বাড়ির কার্ণিশ ডিঙিয়ে যখন চাঁপা গাছটার মাথায় পড়ন্ত সূর্যের আলো এসে পড়ে, সবুজ পাতাগুলি দেখা যায়, স্বর্ণাভ ফুলগুলি লুকোচুরি খেলে ছোট্ট পাখীদের সঙ্গে, তখন বেণীমাধব ওঁর শৈশবকে ফিরে পান। চণ্ডীমণ্ডপের পিছনে ওঁর নিজের হাতে তৈরী বাগানে ছেলেমেয়েরা যখন কুল কুড়োয়, পেয়ারা পাড়ে, কানামাছি খেলে, লাফালাফি ছুটাছুটি করে, অকারণ খুশীতে উচ্ছল হয়ে ওঠে, তখন বেণীমাধবও মনে মনে খেলা করেন ওদের সঙ্গে।

সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর জীবনসংগ্রামের পর এবার বিশ্রাম। পরিপূর্ণ শান্তি। এ যেন আবার শৈশবে ফিরে আসা। শুধু সুহাসিনী যদি থাকত!

কাজ যখন ফুরিয়ে গেল, জীবনের পাত্র ভরে উঠল অর্থ যশ প্রতিষ্ঠার সার্থকতায়, তখন ছুটি নিলেন ছেলেমেয়ে, সুখী সংসারের কাছ থেকে। ঠিক তখনই মনে হল কী একটা যেন পান নি। কিসের একটা অভাবে শূন্য অর্থ-হীন লাগছে জীবনটা। সে কি শৈশব-কৈশোরকে ফিরে পাবার আকুতি? সুহাসিনীকে বললেন, চলো আমরা মহাগ্রামে ফিরে যাই। সুহাসিনী আপত্তি করেননি। তিনিও যেন বৌ-দের সংসারে স্থান খুঁজে পাচ্ছিলেন না। নিজেকে অকাতর অবাঞ্ছিত মনে হচ্ছিল। বললেন, সেই ভাল। ছেলেরা বলল, মাথা খারাপ হয়েছে তোমার? গ্রামে গিয়ে থাকতে পারবে? তার চেয়ে টালিগঞ্জের ওদিকে একটা বাংলো তৈরী করে নাও।

বেণীমাধব বললেন, তোমরা তো শহরে মানুষ হয়েছো, তোমাদের জন্মভূমি এখানে। তোমরা বুঝতে পারবে না। আমার ছোটবেলার সেই গ্রাম, বন্ধু-বান্ধবদের তো অন্য কোথাও খুঁজে পাব না। ভালই তো হবে ছুটিছাটায় বেড়াতে যাবে তোমরা। আমরাও আসব মাঝে মাঝে।

সুহাসিনীকে নিয়ে গ্রামে চলে এলেন বেণীমাধব। যাদের জন্যে ফিরে আসা তারা অনেকেই এখন নেই। কমল সীতানাথ মারা গেছে, সুরেনটা

অথর্ব হয়ে পড়ে আছে। আবার কে যেন সেদিন কুড়ুল দিয়ে নিজের পা-টা কেটে ফেলল ! রাধাই না গণেশ ? কে ? কিছুতেই মনে পড়ছে না।

এক এক সময় হঠাৎ এমনি ভুলে যান বেণীমাধব, জোট পাকিয়ে যায় চিন্তাসূত্রে। তখন অস্থির বিরক্ত হয়ে ওঠেন। দীনুকে তখন প্রয়োজন হয়। জোট খুলে দেয়, ভুল ভাঙিয়ে দেয় দীনু। অতীত থেকে বর্তমানে ফিরে আসার সেতু এই দীনু বাউড়ি।

দীনুকে দেখে মনে পড়ল, গণেশ ছিল কমল রেজের বাবা। সে যখন কাঠ কাটতে গিয়ে পা কেটে ফেলেছিল তখন দীনুর বয়স পাঁচ কি ছয়। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে আসত বেণীমাধবের বাড়িতে। তারপর একটু বড় হয়ে ওর দাদা কালো যখন মুনিষ খাটতে গেল তখন গোরু চরানোর ভার পড়ল দীনুর ওপর।

বেণীমাধব বুঝতে পারলেন স্বপ্নের ঘোরে তিনি কালোকে ডাকছিলেন। রাধাই-এর খোঁড়া পায়ের সঙ্গে গণেশ কর্মকারের কাটা পা একাকার হয়ে গিয়েছিল। বললেন, রাধাই কেমন আছে, জানিস ? কাল একবার খবর নিস তো।

দীনু বলল, নেব, বড়বাবু। চলাফেরা করতে পারে না, চোকেও ভাল দেখে না। অসুখটার পর কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গিয়েচে। গেলেই হাউমাউ করে কাঁদে। আপনার কতা শুধোয়। বলে, আমাকে কোলে করে নিয়ে চ' দীনু একবার। দেকে আসি, দুটো কতা বলে প্রাণটা জুড়োই।

বেণীমাধব বলেন, আহা, বড় ভালবাসে আমাকে রে। আমার ছোট-বেলার বন্ধু যে। রাধাই, সীতানাথ, কমল, বিভু আর আমি একসঙ্গে কত খেলা করেছি। ওদের জন্যেই তো ফিরে এলাম রে গাঁয়ে। তা দেখ, কমলটা সেদিন গেল। তার আগে বিভু চলে গেল, সীতানাথ গেল—

বাধা দিয়ে দীনু বলল, সে কি বলচেন বড়বাবু! চাটুজ্জেমশাই তো কাল রেতেও এসিছিলেন।

য়ঁ্যা ? চমকে উঠে বেণীমাধব বললেন, ও, হ্যাঁ। আজকাল কিরকম ভুল হয়ে যায় দেখ, বিভুটা শুনলে কি ভাববে বল্‌তো। কার কথা যেন ম—

একই কথা বার বার শুনে শুনে দীনুর এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। ভুলটা ধরিয়ে দেয়। বলে, কমল রেজের কথা বলছিলেন আজ্ঞে। তা বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন রেজ মশাই—যাওয়া একরকম ভালই হয়েচে।

বেণীমাধবের মনে পড়ল, সুহাসিনীও বড় কষ্ট পেয়েছিলেন শেষের ক'দিন। তখন বলতেন, এই যন্ত্রণা থেকে আমার মৃত্যুই ভাল। একটু বিষ যদি পেতাম। শুধু তোমার কথা মনে হয়, নইলে,—

বেণীমাধবের ঘোলাটে চোখে একবিন্দু জল জমে ছিল, সেটা মোছার চেষ্টা করলেন না। এক সময় ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেল।

বড় একা লেগেছিল কিছুদিন। দীনু তখন থেকে সব সময়ের জন্ত কাছে রয়ে গেল। তারপর সবই সহ্য হয়ে গেছে।

তবু, হঠাৎ এক এক সময় চমকে ওঠেন। সুহাসিনীর কথা ভাবতে ভাবতে আর একজন কার কথা মনে পড়ে। সুহাসিনী আর সে যেন মিশে যায়, পরস্পরের মধ্যে। আবার কখনও মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোরে যখন সুহাসিনীর সান্নিধ্য অনুভব করেন, তখন যেন কিসের একটা অভাবের তীব্র বেদনা ঝলসে ওঠে মনের কন্দরে। সুহাসিনী? নাকি প্রথম যৌবনে দেখা সেই মেয়েটি? কী যেন, কী যেন নাম ছিল তার? কী আশ্চর্য, কিছুতেই মনে পড়ে না। কিন্তু সে তো সুহাসিনী নয়। সে আর একজন। তাকে তো সুহাসিনীর মধ্যে খুঁজে পান না।

সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আলোটা নিয়ে আসতে গেল দীনু। এবার বামুন মেয়ে চা তৈরী করবে এক কেটলি। বিভু চাটুজ্জেমশাই, তিনু ঘোষ, সাতকড়ি মিত্তির এসে জুটবে একে একে। ফরর্ ফরর্ তামাক টানতে টানতে গল্প করবে ওরা। বেণীমাধব খোঁজ-খবর নেবেন। কিছু শুনবেন, কিছু শুনবেন না। হয়তো তন্দ্রা আসবে, স্বপ্ন দেখবেন। তবু এই আড্ডার আমেজটুকু নইলে চলবে না। কেউ না এলে ছট্‌ফট্‌ করবেন। দীনুকে বকাবকি করবেন।

এরি মধ্যে আবার কখন তন্দ্রা এসেছিল। হঠাৎ মেঘের ডাকে চম্‌কে উঠলেন বেণীমাধব।

—দীনু?

সাড়া পেলেন না। আকাশের দিকে তাকালেন বেণীমাধব। কিছু বুঝতে পারলেন না! হয়তো বৃষ্টি আসবে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বৃষ্টি এলে ওরা হয়তো আসবে না। সমস্ত সন্ধ্যাটা তাহলে মাটি হয়ে যাবে।

দীনু এসে লণ্ঠনটা নামিয়ে রেখে বলল, চাদরটা দোব বড়বাবু? ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে, বিষ্টি আসবে মনে হচ্ছে।

বেণীমাধবের ভ্রূ-ছুটি কুঁচকে উঠল। বললেন, তা হলে তো তোর ভারী জা হয় না রে? কেউ আসতে পারবে না। তোকে তামাক সাজতে হবে।। চা দিতে হবে না। ঢুলতে পারবি বসে বসে?

দীনু বলল, না বাবু ঢুলবো কোতা। কী যে—

শেষ কথাদুটো প্রচণ্ড একটা ঝড়ের আবর্তে পড়ে হারিয়ে গেল। লণ্ঠনটা াড়াল করে দীনু চেঁচিয়ে উঠল, এই এসে গেল বড়বাবু। চলুন চলুন। ভতরে চলুন।

বেণীমাধব কোন উত্তর দিলেন না।

ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চণ্ডীমণ্ডপের টিনের চালাটা এবার কাড়ানাকাড়ার ালে উচ্ছল হয়ে উঠল। দীনু আবার চেঁচিয়ে উঠল, শিল পড়ছে বড়বাবু।

বেণীমাধব এবারও কোন সাড়া দিলেন না। তন্দ্রা এসেছে আবার।

ঠিক এমনি একটা সন্ধ্যা। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন সব।

থমথমে গম্ভীর মুখে সে বলল, না, গানটান আজ ভাল লাগছে না।

বেণু বলল, কেন? কী হল? এমন একটা ঝড়জলের সন্ধ্যা—

সে বলল, চল, আমরা কোথাও চলে যাই।

—কোথা যাবে এখন এই ঝড়জলে? তোমার মা ছাড়বে?

উত্তেজিতভাবে সে উঠে দাঁড়াল। আঃ, তুমি কিচ্ছু বোঝ না। জানো, আমার পায়ে বেড়ি দেবার চেষ্টা করছে?

বেণু বলল—মানে, বিয়ে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ। তা ছাড়া আবার কি?

বেণু বলল, বাঃ, তা তো করবেই। বড় হয়েছ, পাশ করেছ—

ঝাঁঝিয়ে উঠল সে, ইয়ার্কি কোরো না। শোনো, তুমি মাকে বলো।

আমি—আমি কি বলবো? অবাক হয়ে গিয়েছিল বেণু।

—বলবে আমার মাথা আর মুণ্ডু। কিচ্ছু কি বোঝ না তুমি?

বেণু বুঝেছে তখন। বিস্ময়ে, আনন্দে, ভয়ে-উত্তেজনায় ওর হৃৎপিণ্ড বোধ-স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

—তুমি, তুমি—বলছ? কিন্তু আমরা যে ব্রাহ্মণ। তা ছাড়া তোমরা লোক। আমরা—তোমার মা-বাবা কি মত দেবেন?—তা কি করে হবে? সে তখন পাশে এসে বসেছিল। বলেছিল, তাতে কি হয়েছে? মা-বাবা

মত না দেন, আমরা রেজিস্ট্রি করে বিয়ে করব। আজকাল তো কত হচ্ছে বলা যায় না বাবা হয়তো মত দিতেও পারেন। এই তো দাদার বন্ধু সেদি মল্লিকদের বাড়ি বিয়ে করল। বাবা-মা সবাই তো গিয়েছিলেন সামাজি বিয়ের দিন।

সন্ত্রস্ত বেণু বলেছিল, আমি কিন্তু বলতে পারব না।

শেষ পর্যন্ত সে-ই বলেছিল ওর দাদাকে। দাদা কিন্তু মত দেননি বলেছিলেন, অশোকের সঙ্গে তুলনা করছিস, জানিস ওরা ব্রাহ্মণ? ওদে সমাজে চলে। তা ছাড়া অশোক ব্যারিষ্টারী পাশ করে এসেছে। টাকা সব মানিয়ে যায়। বেণু ক'টাকা রোজগার করতে পারবে, ভেবে দেখেছিস?

এর পর থেকে ওদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। লুকিয়ে লুকি কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেছিল সে। চিঠি দিয়েছিল। কাপুরুষ বে জবাব দেয়নি। শেষ চিঠির দুটো লাইন এখনো মনে আছে: সাহস নে তো এসেছিলে কেন মন নিয়ে খেলা করতে?

সুহাসিনীও একদিন এই ধরনের একটা কথা বলেছিলেন। রমেন যখ মেজ বৌমাকে বিয়ে করার ব্যাপারে ইতস্তত করছিল তখন সুহাসিনী ধম দিয়েছিলেন রমেনকে—বিয়ে করার সাহস যদি না থাকে তো মেয়েটার ম নিয়ে খেলা করতে গিয়েছিলি কেন? তোর বাবা মত না দিলেও তোর বি করা উচিত। দরকার হয় দু'জনে রোজগার করে সংসার চালাবি।

তা অবশ্য হয়নি। রমেন বাবার ব্যবসায়ে অপরিহার্য ছিল। প্রথ আলাদা বাসা করলেও ওদের শেষ পর্যন্ত বেণীমাধবকেই নিজে গিয়ে নি আসতে হয়েছিল। সেই মেয়েটির কথা তখন মনে পড়েছিল। মনে হয়েছি কী ক্ষতি হতো তিনি যদি ওকেই বিয়ে করতেন? কিন্তু কী যেন নাম ছিল তার

বেণীমাধব চমকে উঠলেন। দীনু বলছে, কাদের একখানা গাড়ি আসছে বড়বাবু।

—গাড়ি? কাদের গাড়ি? এই ঝড়বৃষ্টির মধ্যে—

দীনু হাঁক দিল, কোতাকার গাড়ি গো-ও-ও?

জবাব এল, ছোটকুটি গো। ছোটকুটি যাবো—

দীনু গলা চড়িয়ে বলল—তা ইদিকে কেন? রাস্তা ভুল করেচ যে—যাব কি করে আঁদারে রাত্তিরবেলা জল ঝড়ে? একটা আলোও তো নেই দেকছি

উত্তর এলো : আচে গো, আচে, মশায়। তা এই বিষ্টিতে জ্বালাই কমনে? মাঠাকরুণরা বললে—হেট, হেট।

দীনু বেণীমাধবের অনুমতির অপেক্ষা না করেই ঘরের ভেতর থেকে টর্চটা নিয়ে গেল। —দাঁড়াও গো। বাঁ দিক চেপে এসো, ডাইনে নালা আছে।

ছোটকুটি। ছোটকুটি। নামটা যেন চেনা চেনা।—একবার যেন ছোটবেলায়···

গাড়িটা বাগানের কাছে এসে পড়েছে। মেয়েদের গলা শোনা যাচ্ছে। —ও সিধু, দাঁড়া বাবা, এখানেই দাঁড়া। মানুষ-জন আছে, আশ্রয় আছে। জানলে না হয় ষ্টেশনেই থাকতাম। এমন জল ঝড়, বাপু।

দীনু বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এইদিকে। চণ্ডীমণ্ডপে এসে দাঁড়াও হে।

গাড়িটা চণ্ডীমণ্ডপের প্রাঙ্গণে এসে উঠল।

ছোটকুটি—ছোটকুটি—কী যেন একটা ঘটেছিল। কিসের একটা বেদনা-আনন্দময় স্মৃতি জড়িয়ে আছে নামটার সঙ্গে। সে কি সুহাসিনী···না অন্য কেউ? কেমন যেন গোলমাল হয়ে যায়—হঠাৎ এক একটা ঘটনা দ্বীপের মত মাথা তোলে মনের সমুদ্রে। তারপর তলিয়ে যায়, হারিয়ে যায়। সুহাসিনী কি সেই না-পাওয়া ফিরিয়ে-দেওয়া মেয়েটি? না না। সে তো ছোট একটা ফ্রক-পরা মেয়ে, ছোটকুটির জঙ্গলে প্রথম দেখা হয়েছিল। কি যেন নাম ছিল তার? কিছুতেই মনে পড়ে না। সেই আমলকী গাছটা কি বেঁচে আছে এখনো? ভাঙা নীলকুঠি আজও গেলে দেখা যায়? ভাঙা দেওয়ালের পাটিলে টুকটুকে টসটসে বঁইচির ঝাড়গুলো?

এখান থেকে পশ্চিম মুখে পদ্মবিলের বাঁ পাশ দিয়ে যে রাস্তাটা চলে গিয়েছে সেটা ধরে মাইল আষ্টেক গেলে বেলডাঙ্গা—বেণুর মামার বাড়ি, তার পাশের গ্রাম ছোটকুঠি। বঁইচি পাড়তে যাওয়া তো সেই মেয়েটির জন্যেই। কেউ সাহস করেনি, বেণু উঠে পড়েছিল ভাঙা দেওয়ালের উপর। নীচে থেকে মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠেছিল—সাপ, সাপ। সাপ আছে ওখানে। নেমে এসো শিগ্‌গির। বেণু চকিত হয়ে নামতে গিয়ে পায়ে চোট খেয়েছিল। তারপর মেয়েটির বাড়ি গিয়ে চুণ-হলুদ লাগাতে হয়েছিল। মামা গিয়ে নিয়ে এসেছিলেন সন্ধ্যার পর।

দীনু ফিরে এসেছে। বলছে, তিন খানা কাপড় দিতে পারলে ভাল হয়

বড়বাবু। সবাই ওনারা ভিজে গিয়েচে।

বেণীমাধব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। কাপড়? কার? কি জন্তে!

দীনু বললো, ওই যে ছোটকুটির একখানা গাড়ি এলো না? দু'জন মাঠাকরুণ, একজন ছেলে।

—ও ছোটকুটি, ছোটকুটি হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেছিস বটে। তা কাদের বাড়ি যাবে রে?

—আজ্ঞে তা তো জানি না, বাবু। বলছিলাম কি, মাঠাকরুণদের দু'খান শাড়ী দরকার, তা—

বেণীমাধব এতক্ষণে বর্তমানে ফিরে এসেছেন। বুঝতে পেরেছেন দীনু কি বলতে চায়।—বললেন, তোর বড়মার আলমারীটা খুলবি বলছিস্? ত খোল—ও আর কী হবে বল। অতিথি সেবায় লাগুক। ছোটকুটির লোক— আমার মামার বাড়ির দেশ রে।

দীনু উৎসাহিত হয়ে বলল, তা হলে বাবু, ওনাদের বরং ডেকে নিয়ে আসি এখানে। এই জলঝড়ের রাত—

বেণীমাধব বললেন, বেশ তো। নিয়ে আয়, রাতটা এখানে থেকে যাক্। তা হলে বামুনমেয়েকে বল, রান্না চড়িয়ে দিক। এই বৃষ্টিতে অতিথিদের ছেড়ে দেওয়া—না, না, সে কি হয়? ডেকে আন ওঁদের।

—আমিও তাই বলছিলাম বড়বাবু। দীনু চাবিটা নিয়ে চলে গেল।

ওরা আসছে চাঁপাতলার পাশ দিয়ে।

—ও দিদা, ধরো আমাকে ভাল করে। যা পেছল, ইস্ পড়েছিলে তে এখ্খুনি।

ভাঙা গলায় জবাব এলো, হ্যাঁ, পড়লেই হলো। আমি কি তোদের মত পাড়াগাঁয়ের মুখ দেখিনি জন্মে। বাবা বেঁচে থাকতে বছরে একবার আসতাম তো ছোটকুটি, তোরা সব আসতে দিস না তাই।

—তা নইলে পাড়াগাঁয়েই থাকতে, নয় দিদা? তাহলে তোমার মুখ দর্শন করতাম না বুঝলে? ঈস্ এখানে আবার মানুষে থাকে। এই দেখো, ধরো ভাল করে।···ঠিক আছে, দিই এবার ছেড়ে—?

আঃ—পিছন থেকে অন্য একটি মহিলাকণ্ঠ শোনা গেল।—কি হচ্ছে, সিধু? বুড়োমানুষ, পড়ে গেলে তখন—

কোথায় গেল দীনুটা। সত্যিই তো, যদি পড়ে যায়? বেণীমাধব ডাক

দিলেন, দীনু ও দীনু, আলোটা ধর ভাল করে।

—এই যে। দীনুর গলা শোনা গেল।—একটু বাঁ দিক ঘেঁষে, দিদিমা, এই যে শান বাঁধান আছে। ব্যাস—আর ভয় নেই, চলে আসুন।

প্রৌঢ়াটি বোধ হয় ছেলেটির মা। দাওয়ায় উঠে এসে প্রণাম করলেন, কী উপকার যে করলেন আপনি আশ্রয় দিয়ে। এই জলঝড়ে মাকে নিয়ে যে কি মুস্কিলেই পড়েছিলাম।

বেণীমাধব বললেন, এসো এসো মা। উপকার আর কি বলো। তোমরা এলে এই আমার ভাগ্য। একা মানুষ। পড়ে আছি এই দীনুটাকে নিয়ে। কেউ এলে গেলে, দুটো কথা বললে, ভাল লাগে। কেউ নেই মা, যাও, ভিতরে যাও। ও দীনু—

বৃষ্টি থামলে গাড়োয়ানটা গাড়ি ছাড়ার প্রস্তাব করতে সিধু হৈ হৈ করে উঠলো। তুই তাহলে একা গাড়ি নিয়ে চলে যা। আমরা কাল হেঁটে যাব।

বৃদ্ধা একবার মৃদু আপত্তি তুললেন, সারা রাত এঁদের জ্বালাতন করবি দাদুভাই ?

দীনু বলল, জ্বালাতন কি দিদিমা ? বড়বাবু তো লোকজন ভালবাসেন। অন্যদিন এলে দেখতেন কেটলি কেটলি চা আর তামাক চলছে। আপনাদের রান্না চেপে গিয়েছে যে, বড়বাবু ছাড়বেন না।

সে রাত্রে বেণীমাধব স্বপ্ন দেখলেন, তিনি যেন ছোটকুটি যাচ্ছেন। সঙ্গে সুহাসিনী, মেজবৌমা আর মধু। সেই মেয়েটি, হ্যাঁ মনে পড়েছে, সেই মেয়েটির নাম ছিল জয়া। জয়া বলেছিল ওদের বাড়ি যেতে। জয়াদের বাড়ির দরজায় হাসিমুখে দাঁড়িয়ে—ও কে ? একি—এ যে সুহাসিনী ! সুহাসিনী গাড়ি থেকে নেমে কখন ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ? না না সুহাসিনী নয়—কলকাতার সেই কলেজেপড়া—আঃ কী যেন নাম ছিল ? সেই তো। চোখ ফিরিয়ে দেখতে পেলেন, গাড়ির মধ্যে ওঁর অতিথিরা—বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া আর সিধু।

দীনুর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল।

—ওঁরা যাচ্ছেন, বড়বাবু।

চোখ মেলে উঠে বসলেন বেণীমাধব। পূবের জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে।

দরজার ওপাশে বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া আর সিধু। সিধু বলছে,—

—আমরা তাহলে আসি, দাদু।

—এসো ভাই, আদর আপ্যায়ন করতে পারলাম না। ফেরার পথে একদিন থেকে যেও।

বেণীমাধব দাওয়ায় এলেন ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে। বাইরে একটি লোক দাঁড়িয়ে আছে।—কে? লোকটি উঠে এসে প্রণাম করলো।—আমি ছোটকুঠি থেকে আসছি, জয়াপিসির ভাইপো। কতদিন পরে আসছে পিসি। কাল রাতে ওঁদের যাওয়ার কথা। না পৌঁছনোয় ভয় হলো, ঝড়জলে কোন বিপদআপদ— তা দেখি হেবোর গাড়ি চণ্ডীমণ্ডপে দাঁড়িয়ে—

জয়াপিসি, জয়া, জয়া? কে? কোন্‌টি জয়া? প্রৌঢ়া না বৃদ্ধা? বেণীমাধব দু'জনের মুখের দিকে তাকালেন। প্রৌঢ়ার মুখ ঘোমটায় অর্ধেক ঢাকা। বৃদ্ধার বলীরেখাজর্জরিত মুখে সেই মেয়েটির কোন পরিচয় নেই। সে এতো বৃদ্ধা হবে কেমন করে?

প্রৌঢ় গ্রাম্য লোকটি বলে চলেছে, তা আপনি যা উপকার করেছেন— জয়াপিসির সখ, কবে মরে যাবো, বাবার ভিটেটা একবার দেখে যাই। তা দেখুন দিকি কাণ্ড, অসময়ে বৃষ্টি হবে কে জানে।

প্রৌঢ়া ও সিধু এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে।

চমকে উঠলেন বেণীমাধব—একি, একি করছেন?

সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে বৃদ্ধা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন। তারপর মুখ তুলে একটু হেসে বললেন, আপনি তো ব্রাহ্মণ, রায়মশায়। বয়সেও বড়, সম্মানেও বড়, দোষ কি? আমি বিজয়া। সবাই জয়া বলে ডাকতো।

গাড়োয়ানটা তাগাদা দিচ্ছে, বেলা হয়ে গেল, দিদিঠাকরুণ। বৃদ্ধা ধীরে ধীরে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন।

বেণীমাধবের সমগ্র সত্বা আনন্দবেদনাময় একটি অস্ফুট শব্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো: জয়া! হ্যাঁ, এই তো সেই ছোট্ট জয়া, যৌবনের বিজয়া। পঞ্চাশ বছর পূর্বের কলকাতার সেই ঝঞ্ঝাহত সন্ধ্যা একটি গ্রামের কিশোরের বৈকালের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে সেই মিলনলগ্নটিকে আঁকড়ে ধরতে গেলেন বেণীমাধব।

দীনু চীৎকার করে উঠলো, বড়বাবু।

গাড়িটা তখন চলতে শুরু করেছে।

খোকনের জন্মদিন

দেখতে দেখতে ব্যাপারটা বিরাটই হয়ে গেল। প্রথমে অজিত আপত্তি করেছিল। মালা বলেছিল, বাধা দিও না তুমি। অনেকদিন ধরে প্ল্যান করে আছি। খোকন সোনার জন্মদিন হবে না, তাই কখনো হয়! সেদিন ওরা কত ধুমধাম করল আট বছরের মেয়ের জন্মদিনে, আর আমাদের খোকনের প্রথমবারে কিছু হ'বে না?

অজিত বলেছিল, ইচ্ছা তো হয়, মালা। কিন্তু কী দিনকাল পড়েছে দেখছ তো। এই সেদিন অন্নপ্রাশনে অতগুলো টাকা ধার হয়ে গেল। তা ছাড়া বলতে গেলে তো অনেককেই বলতে হয়। শেষ পর্যন্ত তাল সামলাবো কী করে?

মালা বলেছিল, সে তোমাকে ভাবতে হবে না।

—তার মানে? অজিত অবাক হয়ে তাকিয়েছিল।

—মানে তোমার বাজারের টাকায় টান না পড়লেই হল তো?

অজিত মাথা চুলকালো, তুমি কি বলছো বুঝতে পারছি না। তুমি টাকা-পয়সা জমিয়েছ নাকি কিছু?

মালা একটা রহস্যময় হাসি হেসে বললে, টাকা কোথায়? তোমার জ্বালায় বাঁচানোর কিছু উপায় আছে! প্রতি মাসেই তো শেষ দিকে দিয়ে দিই।

—তার মানে ধার? না, না, ধার টার করে হৈ হৈ—

মালা ধমক দিয়ে বলল, বলছি না ধার-টার করতে হবে না? আমি ম্যানেজ করবো।

—কিন্তু কোত্থেকে?

মালা চোখ নাচিয়ে বললে, সে এখন বলবো না।

দিন তিনেক আগে বলতে হলো। কারণ মালা তো নিজের চুরি দু'গাছা বিক্রি করতে যেতে পারে না। অজিত রেগে গিয়ে বললো, এই তোমার ব্যবস্থা? আমি এক্ষুনি সব বন্ধ করে দিচ্ছি।

মালা আঁতকে উঠলো, না, না শোনো, তোমার পায়ে পড়ি এখন সব বলা

হয়ে গেছে—দাদাদের পর্যন্ত। লক্ষীটি, তুমি বুঝতে পারছ না, এ তো আবার ফিরেই আসবে। তখন কিনে দিও আবার। না হয় বাঁধা রেখেই টাকাটা আনো।

অজিত গজ্ গজ্ করে—হ্যাঁ, পুরানো ধারই শোধ করতে পারলাম না এখনো।

মালা আর একটু কাছে ঘেঁষে এসে বলে, তুমি এমন অবুঝ, খোকনের অন্নপ্রাশনে যা খরচ হয়েছিল, পাওনা হয়েছে তার থেকে অনেক বেশী, ভেবেছ সেটা? সবাইকে ডেকে হৈ চৈ করা হলো, অথচ এদিকে—

হিসাব খতিয়ে দেখলে মালার কথা মিথ্যে নয়। খরচ হয়েছিল শ' দুয়েক টাকা। আর খোকন যা কাপড়-জামা, থালা-বাটি, আংটি-বালা ইত্যাদি পেয়েছিল তার দাম তিনশোর বেশী বই কম নয়। তার ওপর নগদ টাকাও শ'দুয়েক। বলতে গেলে ধারের টাকা প্রায় শোধ হ'য়ে এসেছে—এদিকে খোকনের আংটি-বালা তো রয়েই গেল।

মালার যুক্তির কাছে হার মানতে হলো অজিতকে। তবু একটু খুঁত খুঁত করে বললে, করবে যখন ঠিক করেছ, করো। তবে বেশী লোকটোক বলতে যেও না, যাকে না বললে নয়—শুধু তাদেরই বলবে। আর খরচপত্র বেশী বাড়িয়ে ফেলো না। একগাছা চুরি ফেরত দিয়ে বললে, যা হয় এর মধ্যেই করতে হবে।

একগাছা চুড়ি থেকেই বা লাভ কি? ও তো ভেঙে নতুন করতে হবে। ঠিক শিখার মত। কি সুন্দর প্যাটার্ণটা। তবু মালা তখনকার মত আর কিছু বললে না। রাজী যখন হয়েছে, কাজে নেমে পড়লে তখন দেখা যাবে। কত কমিয়ে, কত জনকে বাদ দিয়ে করতে পারবে শেষ পর্যন্ত সে কি আর জানে না? অজিতকে জানতে বাকী নেই তার এই তিন বছরে।

মালা ভেবেছিল ঠিকই। রাত্রে এসে অজিত বললে, দেখো, খাওয়া-দাওয়া যখন হচ্ছেই তখন নীতীশবাবু আর জিতেনদাকে বলা উচিত, কী বলো?

মালা মনে মনে হেসে বললো, বাঃ বলোনি তুমি? কী লোক তুমি গো। নীতীশবাবু জিতেনবাবু তোমার ডিপার্টমেণ্টের হর্তাকর্তা। এই সুযোগে খাইয়ে দাও। তুমিই বলেছ, কতবার নিজে থেকে খেতে চেয়েছেন ওঁরা।

আমতা আমতা করে অজিত বললে, হ্যাঁ তা তো ঠিকই। কিন্তু অফিসের অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে শুধু যদি নীতীশবাবু আর জিতেনদাকে বলি তো, ওরা

বলবে অফিসারদের সঙ্গে খাতির জানাচ্ছি। সে খুব খারাপ হবে।

মালা জানতো এটা হবে। তবু বাইরে একটু গম্ভীর হবার ভাব দেখিয়ে বললে, কথাটা অবশ্য ঠিকই। তা যা হয় হবে। তুমি বলো সবাইকে। হচ্ছে যখন তখন ভালো করেই হোক।

সুতরাং ব্যাপারটা বিরাটই হয়ে গেল। এবং মালার দ্বিতীয় চুড়িগাছাও বিক্রী করতে হল।

তা হোক। মালার আনন্দের সীমা নেই। কোমরে কাপড় জড়িয়ে রান্না করছে। পাশের বাড়ির বেলা আর সুধাকে ডেকে নিয়েছে সাহায্যের জন্য। খোকন এর কোলে তার কোলে ঘুরছে। অজিত এটা-ওটা আনা নেওয়ার কাজে ব্যস্ত। ফুরসৎ নেই কারো। ছ'টার মধ্যেই রান্না শেষ করতে হবে। কারণ অফিসের দল সোজা চলে আসবে ছুটির পরে।

পড়শী মহিলারা তো চারটে থেকে আসা-যাওয়া করছে। পাঁচটার মধ্যে মালার বৌদি-বোনেরা এসে গেল। ওদের সাজ-গোজের পাশে মালার একটু কিন্তু-কিন্তু লাগছিল। পাছে হাতের চুড়ির অভাবটা নজরে পড়ে সে জন্য প্রায় গহনা-পত্র কিছুই পরেনি।

বড় বৌদি লক্ষ্য করছিল, এক সময় বলেই বসল, এমন করে ঘুরে বেড়াচ্ছো কেন? লোকজন আসবে। ছেলের মাকে এমন করে গলা আর হাত খালি রাখতে নেই। যাও পরে এসো। মেজদি ঠেস দিয়ে বললো, দেখ না মালা এখন কেমন গিন্নী-গিন্নী হয়েছে। রান্নাবান্না কত কাজ। এখন ওর সাজগোজের সময় কোথায়? না কি রে? ছোট বৌদি বলল—আহা তাই বলে সাজগোজ করবে না? তা যাই বলো বাপু, ছেলের মা শুধু গলায় থাকতে নেই। হারটা অন্ততঃ পরে নাও। খালি-খালি লাগছে।

মালা বাঁচল। ভাগ্যে চুড়ির কথা বলেনি। তাড়াতাড়ি গিয়ে হারটা পরে এল। —চুড়িচুড়ি বাপু এখন পরতে পারবো না, উনুনের পাশে থাকতে হচ্ছে তো।

কী আনল ওরা? অজিত একবার ওরই মধ্যে শুধিয়ে নিল। মালা বলল, নিশ্চয়ই কিছু এনেছে। না হয় দাদারা আনবে। তোমার অফিসের লোকেরা কী আনলো?

—একটা প্র্যাম এনেছেন নীতীশবাবু আর জিতেনদা। দেখোনি ? ওই তো।

—বাঃ খোকনের খুব মজা হবে। তুমি রোজ বেড়াতে নিয়ে যাবে, অফিস থেকে ফিরে।

—এই পাড়ায় এটা বার করলে হাসবে লোকে।

—ইস্ হাসলেই হ'লো ? নেই, তাই চড়ে না কেউ।

—ও মালা, কোথায় গেলে ভাই ? শোনো একবার এদিকে একটু। ঘি লাগবে যে।

ছোট বৌদি ডাকছে। এখন কি কথা বলার সময় আছে ?

—ওমা বড়দা কখন এলে ? এত দেরী হল যে ?

—এই তো দেখ না। অফিস থেকে ফিরে বাসে-ট্রামে যা ভীড়। তারপর একটা কিছু—কই খোকন কই—?

—এই তো, সীমা এগিয়ে এল। কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে বলো তো দাদা।

—বাঃ। ওকে একবার বসিয়ে দে তো ঘোড়াটার উপর।

মালা দেখল বড়দা একটা সীটওলা রকিং হর্স এনেছে। একটু ছায়া পড়লো বৈকি মনে। কিন্তু এখন কি ওকথা ভাবার সময় আছে ? অফিসের লোকেরা চলে যাবার আগে ডাকাডাকি করছে। হাসিমুখে এগিয়ে গেল মালা।

এবার দাদা-বৌদিদের ব্যবস্থা করতে হবে।

পাড়ার লোকদের খাওয়া দাওয়া চুকতে এগারোটা। তারপর অজিতকে খাইয়ে মালা সুধা আর বেলাকে নিয়ে এক সঙ্গে বসল।

এখনই কি শেষ ? জিনিষপত্র যা বেড়েছে গুছিয়ে রাখতে ঘণ্টা খানেক তো লাগবেই। দইটা প্রায় শেষ, মিষ্টি বেঁচেছে কিছু। রান্না তরকারী রয়ে গেছে অনেকখানি। কী আর হবে ? ও আর কাল খাওয়া যাবে না। লুচি আর পোলাও কিছু কিছু বেঁচেছে। ওগুলো কাজে লাগবে। ঘি-দালদার জিনিষ নষ্ট হবে না। মাংস একেবারে শেষ, ওদের নিজেদের শেষ পর্যন্ত ঝোল আলুই জুটেছে। টকটা বেশী টক বলে কেউ কেউ নিয়ে পাতেই ফেলে রেখেছে। নষ্ট হয়েছে অনেক। তবু অনেকটা রয়েছে। মাছটা ভাল হয়েছিল। চেয়ে নিয়ে খেয়েছে সবাই। মাংসের মত পাতে ফেলে নষ্ট করেনি।

ভাজা মাছ তুলে রাখলে হতো। কাল খেয়ে অফিস যেতে পারত অজিত।

যাই হোক খুশী মালা, ওর রান্নার প্রশংসা হয়েছে।

তবু মালার মনে কী একটা খচ্‌খচ্‌ করছে। সংসারের টাকা থেকেও কিছু খরচ হয়ে গেছে। কী বলবে অজিতকে? কোথা থেকে চালাবে এ ক'টা দিন। মাসের শেষে কী ধার করা যাবে? হাত একেবারে খালি হয়ে গেল।

মালা আশাহত হয়েছে। বড়দা এনেছে রকিং হর্স, ছোড়দা এনেছে একসেট জামা-প্যান্ট আর একগাদা খেলনা। সোনার জিনিষ বলতে গেলে দিদিই একটা আংটি দিয়েছে। পাড়াপড়শীদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে বিস্কুট, পাউডার, খেলনা, জামা-প্যান্ট। মনে মনে হিসাব না করে পারল না মালা। মোটের উপর বোকামি করে ফেলেছে সে এত হৈচৈ করে।

সবাই চলে যাওয়ার পর অজিত বলল, কী, মুখটা এত ভার-ভার কেন? যা চেয়েছিলে তাই তো হলো। তোমার রান্নারও তো খুব প্রশংসা হয়েছে। জিনিষপত্রও কম পড়েনি। ভালই তো হলো, না?

বিষণ্ণভাবে মালা হাসল, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই খুব খেটেছি তো। তাই ভীষণ ক্লান্ত লাগছে।

শোবার আগে অজিত বললো, ওহ হো, এই দেখো, ভুলে গিয়েছিলাম। সুবোধরা পঞ্চাশটা টাকা দিয়ে গিয়েছে, খোকনকে কিছু কিনে দেবার জন্যে। এমন লজ্জা লাগে টাকা নিতে অথচ ওরা একেবারে রাগারাগি করতে লাগলো।

মালার মুখে এবার সত্যিকারের হাসি ফুটল। ভাগ্যিস ওরা টাকা দিয়েছিল। ঘুমন্ত খোকনের মুখে একটা চুমু দিয়ে বলল, তোমার অফিসের বন্ধুরা কিন্তু সব বেশ ভাল।

পরিস্থিতি

শীতের বর্ষা। ভোর থেকে সীসে-ভারী আকাশ ভেঙে কান্না ঝরছে কখনো ঝিমঝিম, কখনো ঝিরঝির, কখনো টিপ্ টিপ্। বরফ-ভেজা কন্‌কনে হাওয়া আসছে এলোমেলো। মন্থর বিষণ্ণ দিনটা গড়িয়ে চলেছে। সেই যে দুপুর বেলায় নলিনী খাবার সময় একবার উঠেছিল তারপর আর বিছানা থেকে নামেনি। এমন কি সাতাশ নম্বরে গিয়ে তাসের আড্ডায় যোগ দেবার উৎসাহটুকু পর্যন্ত নেই।

ক্লান্ত মনের তিক্ত রোমন্থন ছাড়া আজকের এই বর্ষাঘন রবিবারটার কোন মূল্য নেই। শুধু পাঁচটা টাকার অভাব এমন একটা ছুটির রোমাঞ্চকে মুছে দিতে পারে কে ভেবেছিল আগে।

সুরমা দিন তিনেক আগে বলেছিল। প্রত্যেকবারই বলে। কিন্তু পাঁচ দশ টাকার জন্য কোনদিনই ভাবেনি নলিনী। যে কোন মুহূর্তে, এমন কি তিরিশ তারিখেও, যোগেন পঁচিশ-ত্রিশ টাকা ধার দিয়ে এসেছে বরাবর। কিন্তু এবার যে এমন করে ডোবাবে কে জানতো। শনিবার, মাসের ছাব্বিশ তারিখেই বলে বসলো, টাকা তো নেই রে, রেডিও কিনেছি একটা এ মাসে।

কী দরকার ছিল যোগেনের রেডিও কেনার? আর কিনলোই যদি, আড়াই শো টাকাতেও তো পাওয়া যায়, তাই নিলেই হত। সব টাকাগুলো নিঃশেষ করে ফেলার কী মানে হয় ওর? হন্তদন্ত হয়ে শেষ মুহূর্তে এর কাছে তার কাছে এমন কি বুড়ো চাপরাশীটার কাছে পর্যন্ত খোঁজ করেছে সে, পায়নি।

সেই সকাল থেকে কথা বলেনি সুরমা, সারা দুপুরটা কী করছে ও ঘরে বসে সেই জানে। সুরমার তিক্ত কথাগুলো মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করতে করতে সারা জীবনের অপূর্ণতার কথাটাই ভাবছিল নলিনী। লোয়ার ডিভিশনের কেরানীর পদে থেকে কোনদিন কি সে স্বচ্ছন্দ জীবনের মুখ দেখতে পাবে? কী করছে সে? কিছুই না। দুশো তেতাল্লিশ টাকা মাইনেয় কোনমতে বেঁচে আছে শুধু, আপিস করে, ডিটেকটিভ নভেল পড়ে,, তাস খেলে, আর ক্বচিৎ

কখনো বাংলা সিনেমা দেখে। ভাগ্যে কোয়ার্টারটা পেয়েছিল নইলে আধপেটা খেতে হতো। হঠাৎ আজ প্রবীণের মতো হিসাব নিতে বসেছে নলিনী। ডিটেক্‌টিভ নভেলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, ক্রসওয়ার্ডের কাগজপত্রগুলো গুটিয়ে রেখেছে বিছানার নীচে। কিছুই করছে না, শুধু একটির পর একটি ধারে আনা সিগারেট পুড়িয়ে চলেছে, আর ভাবছে। রেগে উঠছে নিজের ওপর, সুরমার ওপর, যোগেনের ওপর, নাক-উঁচু নতুন অফিসারটার ওপর, এমন কি সারা দুনিয়াটার ওপর।

আবার জোর বৃষ্টি এল বুঝি। বৃষ্টির কণা আসছে আধ-খোলা জানালাটার ফাঁক দিয়ে। শেষে বাতাসটাকেও আটকে দিল নলিনী। ভিতরের দরজাটা ওদিক থেকে বন্ধ, কিন্তু মাঝখানের দরজাটা শুধু ভেজানো। ইচ্ছা করলেই ও ঘরে উঠে যেতে পারে, সুরমার সঙ্গে ঝগড়াটা মিটিয়ে নিতে পারে, বর্ষণ-মুখর বিকালটা ঘরে বসেই সুন্দর করে তুলতে পারে নলিনী। সে সব কিন্তু কিছুই করলো না, শুধু বন্ধ জানালার কাঁচের ভিতরদিয়ে তাকিয়ে রইলো রাস্তাটার দিকে।

দেখতে দেখতে দু-পাশের জল এসে জমতে জমতে মাঝখানের ক্ষীণ অ্যাসফল্ট রেখাটাকে ডুবিয়ে দিলো। মোটর আর টাঙ্গার সংখ্যা কমে এসেছে লোক চলছে কদাচিৎ। গাছগুলো মাথা কুটছে এ-ওর গায়ে, আকাশে। কী চায় ওরা?

অনেকক্ষণ বন্ধ থেকে গুমোট হয়ে উঠেছে ঘরটা। মাথা থেকে চাদরটা নামালো না নলিনী, জানালাটা খুলে দিল। নাঃ ছাটটা অন্যদিকে চলে গেছে। আহ্‌হা' রাস্তাটার ওপর জল জমে গেছে এক হাঁটু। মোটরটা ওদিকেই চলেছে যে। বেশ তো যাচ্ছে জলের মধ্যেও? নাঃ বন্ধ হয়ে গেছে এবার। মনে মনে খুশি হযে উঠলো নলিনী। খুব যে মোটর দেখাচ্ছিল। যাও, যাও এবার?

অসহায়ভাবে ইঞ্জিনটা গর্জন করলো বার চারেক। তারপর আর সাড়াই দিল না। টাঙ্গাওয়ালাটা যেতে যেতে চাবুক উঠিয়ে হাসলো একবার। ত্রিপল জড়িয়ে বসে আছে সে, তার গাড়ি আটকাবে না।

ভদ্রলোকটি নেমেছে জলের মধ্যে, হুডটা খুলে কী যেন দেখছেন। নলিনী মনে মনে বলে উঠলো, দেখলে কী হবে? ইঞ্জিনে জল ঢুকেছে সাহেব, ও চলবে না এখন।

নলিনীর কথাগুলো ভদ্রলোকের কানে পৌঁছুলো নাকি? হুডটা বন্ধ করে সেই ছপ্‌ ছপ্‌ জলের মধ্য দিয়ে রঞ্জিৎ সিং রোডের 'বি'টাইপ কোয়ার্টারগুলোর দিকে এগিয়ে গেলেন এবার।

স্যুটটার অবস্থা দেখে আর একবার নলিনী হাসলো। লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছেন ভদ্রলোক।

নলিনী জানালাটা বন্ধ করে দিল।

লালার দোকান থেকেই চড়া দামে আলুপেঁয়াজ আনতে হবে, হয়তো কয়লার জন্য ওর কাছ থেকেই আট আনা পয়সা ধার করতে হবে আজ, ওই জল ভেঙে তাকেও হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে হবে। তবু নলিনী হাসলো।

বিছানায় উঠে বসে ক্রসওয়ার্ডের কাগজগুলো বার করলো এবার নলিনী। রেঞ্জার্সের টিকিট, ক্রস্‌ওয়ার্ড, ছোটখাট দু-এক টাকার লটারী বাদ দেয় না সে কোনটাই। চান্স কম কিন্তু কেউ না কেউ তো পায়। সে যে কেউ তো সে-ও হয়ে যেতে পারে। আর এ ছাড়া তো স্বচ্ছন্দ জীবনের সম্ভাবনা দূরের কথা, আশাটুকু পর্যন্ত নেই।

সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। উঠে লাইটটা জ্বালিয়ে দেবার মতো মনের অবস্থাও নয় নলিনীর। আধখোলা জানালা দিয়ে পালিয়ে আসা হাওয়াটুকু হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে, বিছানার ওপাশটা বরফের মতো ভিজে, ঠাণ্ডা। নলিনী এবার লেপটা টেনে নিয়ে বুক পর্যন্ত ঢেকে শুয়ে পড়লো। তারপর স্বপ্ন দেখতে লাগলো সেই অসম্ভাব্য দিনগুলোর, যদি সে ফার্স্ট প্রাইজটা পেয়ে যায়।

জল ভেঙে কে একজন এগিয়ে আসছে ছপ্‌ ছপ্‌ শব্দটা সে শুনতে পায়। প্যান্টের শপ্‌শপানি স্পষ্ট হয়ে উঠলো, লোকটা কি এখানেই উঠছে? দরজার কাঁচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ঝাপ্‌সা মানুষটাকে, ভিজে জুতোর আর্তনাদও শোনা যাচ্ছে। মজার একটা কৌতূহল নিয়ে নলিনী তাকিয়ে রইলো দরজার দিকে।

কাঁচের ওপর আড়ষ্ট আঙুলের আওয়াজ হল, ঠুক্‌, ঠুক্‌, ঠুক্‌।

নলিনীকে উঠতে হল এবার লেপটা ছেড়ে। দরজাটা খুললো না, বিছানার ওপরেই উঠে বসে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শুধালো কৌন্‌?

ভাঙা হিন্দীতে জবাব এল, ইধার নলিনীবাবু রহতা হ্যায়?

লুঙ্গটা ভালো করে এঁটে নিয়ে কম্বলটা গায়ে দিল। তারপর লাইটটা
ালিয়ে নিয়ে দরজাটা খুললো নলিনী।

শীতার্ত মেঘলা দিনের থমথমে বিষণ্ণতা এক মুহূর্তে কেটে গেল।

নলিনী অবাক খুশিতে চেঁচিয়ে উঠলো, আরে তুই! তুই কোত্থেকে?
ায় আয়, ভেতরে আয়, এঃ ভিজে একেবারে—

দেবেশ বললো, যাক্, পেলাম তা হলে খুঁজে শেষ পর্যন্ত, সেই সাড়ে চারটে
থকে ঘুরছি। কে জানতো শীতকালে এত বৃষ্টি হয় এখানে।

নলিনী বললো, দিল্লীর ওই মজা, বর্ষাটা শীতে পুষিয়ে দেয়। জিনিসপত্র
নই কিছু সঙ্গে?

—বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ট্যাক্সিটা। বললো, এত জলে আসবে না।
াড়া আমি নিয়ে আসি, তুই আর কেন ভিজবি?

নলিনী বললো, খুব হয়েছে, থাম দেখি।

রেনকোটটা টেনে নিয়ে বললো, চল বিছানাটা তো বাঁচিয়ে আনতে হবে।

বাইরে বেরিয়ে টিপ্ টিপ্ বৃষ্টির মধ্যে জল ভেঙে এগিয়ে যেতে মন্দ লাগছে
া এখন।

বিছানার মধ্যে বসে থেকে এত যে শীত করছিল এখন তো ততটা নেই।
টা বুঝি মানসিক। ভয়ের মধ্যে এগিয়ে গেলে আর ভয় থাকে না। সেই
হুদিন আগের কথাটা মনে হচ্ছে। নবদ্বীপ থেকে ফুটবল খেলে ফিরছে ওরা।
দবেশ আর ও। মাঠটায় ঠিক এমনি জল হয়ে গিয়েছিল ওদের খেলা শেষ
ওয়ার একটু পরেই। অন্য ছেলেরা সেদিন আর ফেরেনি বৃষ্টির ভয়ে।

স্যুটকেশ আর বেডিংটা নামিয়ে রেখে দেবেশ শুধালো, বৌদি কইরে?
াসায় আর কেউ নেই তো?

নলিনী বললো, কে আবার থাকবে? যা না ভিতরে। ও সব সাবলেটের
ভতর আমি নেই, সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো।

দেবেশ শেষের কথাটায় কান দিল কি দিল না, চেঁচিয়ে ডাক দিল, বৌদি,
বৌদি?

রান্নাঘরে বসে চমকে উঠলো সুরমা, এমন করে তো এখানকার কেউ ডাকে
া। আর স্বরটাও যে চেনা-চেনা। কড়াটা নামিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে

দাঁড়ালো সুরমা, যেই হোক কাপড়টা বদলানো দরকার।

বার হতে গিয়েই মুখোমুখি হয়ে গেল। ঠিক সেই মুহূর্তে দরজা খু ভেতরের বারান্দায় এসে পড়েছে দেবেশ।

—এই যে, বাঃ বেশ লোক। কতক্ষণ হল এসেছি, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে গলা চি গেল, পাত্তা নেই।

অপ্রস্তুত মুখে হাসি টেনে সুরমা বললো, ও মা আপনি! কোত্থেকে কখন? আমি বলি কে না কে। চকিতে একবার কয়লা-হলুদের ছাপ-লা শাড়িটার দিকে তাকিয়ে নিল সুরমা।

দেবেশ চট্ করে নীচু হয়ে প্রণাম করে বসতে, সুরমা তিন পা পিছি গিয়ে বললো, ও আবার কি হচ্ছে?

—বাঃ, বৌদি গুরুজন, আপনিই তো বলেছেন।

দেবেশের কথার ভঙ্গিতে সুরমার মুখে সত্যিই হাসি ফুটলো এবার।

—তা হলে আপনার দাদাকেও করুন।

হো হো করে হেসে উঠলো—দেবেশ? ঈস, ওই বরং আমার থে ছ-মাসের ছোট।

নলিনী বললো, হ্যাঁরে থাকবি তো কিছুদিন?

—এলাম যখন দিল্লী, আগ্রাটা না দেখে কী আর ফিরবো। ও বৌদি আপনার ছেলেরা কোথায় গেল? ঝণ্টু পিন্টু?

—ওরা তো নেই এখানে, পড়াশুনা হয় না এখানে ভালো, তাও তি মাইল দূরে স্কুল। পাঠিয়ে দিয়েছি গাঁয়ে ঠাকুরমার কাছে। ওসব কথা প হবে—কাপড়জামাগুলো ছাড়ুন তো দেখি। শীত করছে না?

দেবেশ বলল, ড্রয়ার্স থেকে শুরু করে সোয়েটার কোট কিছুই বাদ নেই ভেতরে পৌঁছতে এখনো কিছুক্ষণ দেরী আছে।

সুরমা বললো, তা হোক, নতুন জায়গা। গরম জলে চান করে ফেলু বরং, ভেজার পর চান না করলে অসুখ করতে পারে!

দেবেশ স্নানের ঘরে গেলে সুরমা বললো, একটা পাঁউরুটি এনে দেবে চা দেবো কি দিয়ে?

নলিনী চট করে মুখটা তুলে ধরে বললো, রাগ পড়েছে মহারাণীর? বাব্ব কী রাগ, সারাদিন কথাই বলোনি।

সুরমা বললো, আর নিজে? সে সব ফয়শালা রাত্রে হবে, এখন তাড়াতাড়ি

যাও তো। আর হ্যাঁ, লালাজীর দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ এনো একসঙ্গে।

নলিনী বললো, কয়লা? কয়লা আনতে হবে না?

—তোমার ভরসায় কী আর বসে আছি আমি এখনো? কয়লা না আনালে উনুন ধরালাম কী দিয়ে? তোমার আর কি? দরজা জানলা এঁটে শুয়ে আছ।

একটা টাকা বের করে দিল সুরমা। নলিনী অবাক হয়ে বললো, ও পয়সা লুকিয়ে রেখে আমাকে জ্বালানো হচ্ছিল সকাল থেকে, অ্যাঁ?

—বটে? কতো পয়সা দাও আমাকে যে লুকিয়ে রাখবো? সকাল বেলায় পুরণো কাগজ বিক্রী করলাম না? দু'টাকা পেয়েছিলাম, দশ সের কয়লা আনিয়েছি, আর এই আছে মোটে। কী দিয়ে যে খেতে দেব দেবেশবাবুকে জানি না। নিজেদেরই চলছে না মাসের শেষে, আবার—

নলিনী বললে, ছিঃ, কী বলছো রমা? কখনো তো আসে না।

সুরমা বললো, আহ্‌া, তাই বলছি নাকি। চাল আটা না হয় লালাজীর দোকান থেকে আনলে। হাতে কিচ্ছু নেই, ভদ্রলোককে আদর আপ্যায়ন—

নলিনী বললো, নাও, দেবুর সঙ্গে আর কুটুম্বিতা করতে হবে না। আমরা যা খাচ্ছি তাই খাবে।

সুরমা বললো, তাই কি হয়? এই তো প্রথম এল আমাদের এখানে। শোনো, তুমি চট্ করে যাও। আর হ্যাঁ, দালদাও একটু এনো। কাল সকালে চায়ের সঙ্গে দেবো কি? রাত্রেও না হয় লুচি ভেজে দেবো, মাছ তরকারী না হলেও চলে যাবে।

সুরমার ভরসা ছিল পরের দিন মাছওয়ালাটা আসবে, তার কাছ থেকে একদিন ধারে নিলেই চলবে। চেনা লোকটা কিন্তু এল না সেদিন, এমন কি পরের দিনও না। ভাগ্যিস্ সবজীওয়ালা এল বুধবার, আর কপি টম্যাটোর সময়, নইলে কী দিয়ে যে খেতে দিত সুরমা। লালাজীর দোকানের আলু পেঁয়াজ আর ডালের বড়া দিয়ে তো আর রোজ রোজ অতিথিকে ভাত দেওয়া যায় না। কিন্তু পরদিনও যখন মাছওয়ালাটা এলো না, সুরমা রেগে গিয়ে রাত্রে বললো, কাল যেখান থেকে পাও পাঁচটা টাকা অন্তত আনতেই হবে। এরকম করে রোজ রোজ নিরামিষ খাওয়ানো যায় মানুষকে? সবাই জানে মাছ মাংস সস্তা এখানে কলকাতার চেয়ে। তিন দিন ধরে শুধু আলু আর কপি।

নলিনী ইতিমধ্যে চেষ্টা করেছে। চিন্তিতভাবে বললো, আর দুটো দিন

তো মোটে, পরশুই তো মাইনে পাচ্ছ।

সুরমা বললো, সে-ও রাতের আগে নয়। না বাপু, আমার লজ্জা করে খেতে দেবার সময়। আর এদিকে রোজ লুচি ভেজে দেওয়া। খরচা হচ্ছে না? মাছমাংস আনলে ভাতরুটি যা হোক দেওয়া যায়।

একটু চুপ করে থেকে নলিনী বললো, তা হলে এক কাজ করি, দেবুর কাছ থেকেই না হয় ক'টা টাকা নিয়ে নিই, কী বলো?

সুরমা অবাক হয়ে বললো, তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? কী ভাববে ও?

—তাই তো বলছি সবাই জানে মাসের শেষ, আর দু-তিনটে দিন যাক্ না। তারপর যত খুশি খাইও।

সুরমা রাগ করে বললো, কাল থেকে তুমি ভাত বেড়ে দিও, আমি পারবো না।

রাগ করলো বটে সুরমা, নলিনীর যুক্তিটাই কিন্তু মেনে নিল শেষ পর্যন্ত। পরদিন নলিনী অফিসে বেরিয়ে যেতে দেবেশকে দ্বিতীয়বার চা দিতে গিয়ে সুরমা বললো, ঠাকুরপো, আপনার কাছে গোটা পাঁচেক টাকা আছে খুচরো? পাশের বাড়ির ভদ্রলোকের অসুখ, ওঁর বৌ চাইছিল—পরশু দিয়ে দেবে মাইনে পেলে।

দেবেশ চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে বললো, দিচ্ছি দাঁড়ান। পাঁচ টাকা খুচরো আছে কিনা—।

বুক পকেটটা দেখে বললো, খুচরো তো নেই বৌদি, ওই সুটকেসটায় আছে খামের মধ্যে—দেখুন দশ টাকার নোট আছে বোধ হয়।

নোটটা নিয়ে নিজেই বাজারে গেল সুরমা। এ বেলায় আর হবে না, ওবেলায় বরং রুটির সঙ্গে মাংস করাই ভালো মাছের চেয়ে। ঝোঁকের মাথাতেই সুরমা মাংসটা বেশীই নিয়ে ফেললো।

বাকী পাঁচ টাকা ফেরত দিতে যেতে দেবেশ বললো, দশ টাকা দিলেই পারতেন, অসুখ-বিসুখের বাড়ি, দরকার হতে পারে।

সুরমা বললো, দরকার হলে নিজেই নিত। ওই তো ফেরত দিয়ে গেল।

বিকেল বেলা দেবেশ বাড়ি ফিরলো না দেখে খুশিই হল সুরমা। রাতের জন্য লুচিই ভাজলো শেষ পর্যন্ত, বিকেলের জলখাবারের ওপর আর খান ছয়েক করলেই হয়ে যাবে। আর মাংসটা তো বেশীই আছে।

দেবেশ ফিরলো সেই ন-টায়। নলিনী বললো, কিরে এতো দেরি যে, গিয়েছিলি কোথায় ?

দেবেশ বললো, আরে সীমন্ত এখানে কমার্স মিনিষ্ট্রির আণ্ডার-সেক্রেটারী। বলিস্ নি তো তুই ? হঠাৎ অফিসে দেখা হয়ে গেল। ধরে নিয়ে গেল বাড়িতে। হ্যাঁরে, বললো তোর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না। ক্লাসফ্রেণ্ড, এক জায়গায় আছিস্ অথচ দেখা হয় না—ব্যাপারটা কি ? মাইনের তফাৎ ?

নলিনী বললো, কতকটা বোধ হয়। দু-একবার গিয়েছিলাম ওর বাসায়, বুঝলাম ঠিক পছন্দ করে না, তারপর আর যাইনি।

—সে কি রে ? শুনেছিলাম বটে এখানে এই রকম, কিন্তু ক্লাসফ্রেণ্ড—? চিন্তিতভাবে দেবেশ বললো, কিন্তু আমাকে তো খুব খাতির করলো, পরশু আবার ডিনারের নেমন্তন্ন করলো। কী বলিস্, রিফিউজ করে দিই ?

নলিনী বললো, বাঃ যাবি না কেন ? বলেছে যখন, নিশ্চয়ই যাবি। তোর সঙ্গে তো কোন খারাপ ব্যবহার করেনি।

সুরমা সাড়া পেয়ে ঘরে ঢুকে বললো, কী এতো দেরী যে ? এদিকে সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেল।

নলিনীকে আগে বলেনি সুরমা, খেতে বসে সে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকাতে সুরমা চোখের ইঙ্গিতে একটা খুশিভরা ধমক দিল শুধু।

দেবেশ বললো, ওরে বাবা, আজ যে একেবারে নেমন্তন্ন বাড়ি। এত মাংস কে খাবে ? আমি কি রাক্ষস নাকি ?

সুরমা বললো, লুচি আর মাংসই তো শুধু। আর বিকেলে তো খাননি কিছু।

দেবেশ বললো, খাইনি আবার, বেশ হেভি টিফিন হয়ে গেছে।

—কোথায় আবার খেয়ে এলেন ? বেশ লোক আপনি। আজই মাংস আনালাম, ওসব শুনছি না আমি। একটুও পড়ে থাকলে চলবে না বলে দিচ্ছি।

দেবেশ বললো, আগে থেকে নোটিশ দিতে হয়। আমি কিন্তু একটা নোটিশ দিয়ে রাখছি, পরশু রাত্রে খাবো না।

সুরমা বললে, পরশুর কথা পরশু, আজ কিন্তু পাতে কিছু ফেলে রাখতে দেবো না। আগে থেকে নোটিশ দিয়ে যাননি কেন।

দেবেশ বললো, তা মাংস কি আর শেষ করা যায় না ? সবটাই খাবো,

কিন্তু একটা সর্তে।

—কি ?

কাল সবাই মিলে বেড়াতে যেতে হবে, রেডফোর্ট, কুতুব, তুগলকাবাদ। সারাদিনের প্রোগ্রাম, বাড়িতে রান্নার ঝঞ্ঝাট করবেন না। পিক্‌নিক্ করা যাবে বেশ।

সুরমা বললো, ও বাবা, ওসব আমার দ্বারা হবে না। সারাদিন ওসব সাহেবী খানা খেয়ে আমার মোটেই চলবে না। যেতে হয় ভাত খেয়ে বেরোব।

দেবেশ বললো, নাঃ, আপনি সেই ঘরকুনোই রয়ে গেলেন। আমরা কোথায় ভাবছি দিল্লীওয়ালা বৌদি শালোয়ার-পাঞ্জাবী চড়িয়ে হিন্দী উর্দু ফার্সী বুলি উড়িয়ে গোস্‌রুটি খেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে কুতুব, রেড ফোর্ট পার্লামেণ্ট, তা নয় সেই শাড়ি জড়িয়ে রান্নাবান্না। সাধে কি আর বলেছে ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

নলিনী বললো, যা বলেছিস, এক্কেবারে ঘরকুনো ঘরণী,, নড়তে চায় না বাড়ি থেকে।

সুরমা ফোঁস করে উঠলো, ঈস্, কত যেন নিয়ে যাও আমাকে। বোলো না আর—

দেবেশ বললো, থাক থাক, ওসব আর আমার সামনে কেন বৌদি ?

—দেখুন না, নিয়ে যায় না কোথাও।

হেসে নলিনী বললো, বেশ তো কাল যাও না দেবুর সঙ্গে। আমার তো হয়ে উঠবে না। দেবু, তুই ওকে নিয়েই দেখে আয় বরং কাল। পিক্‌নিকটা রবিবার হবে।

দেবেশ বললো, কেন, একটা দিন ছুটি নে না।

নলিনী বললো, না রে, নতুন অফিসারটা বড় পাজী।

সুরমা বললো, তোমার আবার ভয় বেশী, সবাই তো কেমন ছুটি নেয়।

নলিনী বললো, অফিসারকে না চটানোই ভালো। ইনক্রিমেণ্টের সময় আসছে, একটা খারাপ রিপোর্ট দিলেই দু-তিন বছর বন্ধ।

নলিনীকে টলানো গেল না। শেষ পর্যন্ত সুরমা আর দেবেশই গেল পরদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে। ফেরার পথে দেবেশ বললো, কী নেওয়া যায় বলুন দেখি, বেশ সব বার জন্ত হবে ?

সুরমা বললো, কেন লতার জন্ম কিছু নেবেন না? ব্যাঙ্গালোর শাড়ি আর জুতো সস্তা এখানে।

দেবেশ বললো, সে পরে হবে। এখন এমন একটি বেশ দিল্লীর জিনিস নিতে হবে যেটা সবাই দেখবে, অনেকদিন থাকবে।

সুরমা বললো, তা হলে একটা তাজ নিন, আর লতার জন্মে হাতীর দাঁতের মালা।

দেবেশ বললো, আগ্রা যখন যাচ্ছি তাজটা কেন আর এখান থেকে নিই? ওই মালা দুটো আর হরপার্বতীটাই বরং নেওয়া যাক্।

পছন্দ করার পর পার্স থেকে টাকা বার করতে গিয়ে দেবেশ চমকে উঠলো, একি! একশো টাকার নোটটা গেলো কোথায়? পকেটের কাগজপত্রগুলো বের করে দেখলো। না, নেই তো। যতদূর মনে পড়ে নোট্‌টা পকেটেই ছিল। পরশু দিন বিকাল বেলাতেই তো বের করে রেখেছিল পকেটে। আবার কি অন্য কাগজপত্রের সঙ্গে সুটকেশে রেখে দিয়ে এলো?

সুরমা বললো, কী হল, টাকা আনতে ভুলে গেছেন তো?

দেবেশ চিন্তিত মুখে হাসি টেনে বললো, তাই তো দেখছি। যাক্‌গে, পরে নেওয়া যাবে এখন, আছি তো এখনো চার-পাঁচ দিন।

বাড়ি ফিরেই সুটকেশটা খুলে ফেললো দেবেশ। টাকাটা না পাওয়া পর্যন্ত ভয় হচ্ছে তার, হারিয়ে গেল না তো।

দু-দুবার কাগজপত্র, সুটকেশের পকেটগুলো দেখলো দেবেশ। আশ্চর্য, কোথায় গেল টাকাটা? খামটা, কালকের রাখা কাগজগুলো তো এই রয়েছে, সুটকেশের তলায় রাখা টাকাগুলোও আছে, কিন্তু বাইরে রাখা একশো টাকাটা উড়ে গেল নাকি। এবার জামাকাপড়গুলো তুলে তুলে এমন কি ভাঁজ খুলেও দেখলো দেবেশ।

নেই!

একবার, দু-বার, তিনবার। শেষ পর্যন্ত প্যান্টকোটের পকেটে হাত ঢুকিয়েও দেখলো একটা আশা নিয়ে। নেই।

হাল ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়লো দেবেশ।

একশোটা টাকা হারিয়ে যাওয়া আশ্চর্য, অবিশ্বাস্য।

পকেট থেকে পড়ে যাবার কথাই ওঠে না, খুচরো টাকা পয়সা তো পার্সেই থাকে। পার্সের যে পকেট থেকে সে খুচরো টাকা খরচ করে সেখানে তো

একশো টাকার নোটটা রাখেনি। কাগজপত্রের সঙ্গে খামের মধ্যেই রেখেছিল তবে কি?

—যে কথাটা চকিতে মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল, সেটা চাপা দেবার চেষ্টা করে দেবেশ। না, না। এ নয়, এ হতে পারে না। একথা সে ভাবেনি ভাবতে চায়নি, এটা সে বিশ্বাস করে না। আছে কোথাও, জামাকাপড়ের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে কোথাও!

সুরমা বুঝি চা নিয়ে আসছে। জামাকাপড়গুলো আলগোছে তুলে রেখে ডালাটা বন্ধ করে ত্রস্ত হাতে একটা সিগারেট ধরায় দেবেশ। তার মনের কলুষ সন্দেহটা বুঝি পড়ে নেবে সুরমা বৌদি।

অগোছালো সুটকেশের দিকে তাকিয়ে সুরমা বলে, কী হল পেয়েছেন তো!

হ্যাঁ, বলতে গিয়েও দেবেশের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল—না।

—সে কি! কতো টাকা ছিল?

একশো টাকার একটা নোট ছিল, সেটাই পাচ্ছি না।—শুকনো গলা দেবেশ বললো।

চা-টা নামিয়ে রেখে সুরমা শঙ্কিতস্বরে বললো, চলুন তো, আমি একবা দেখি।

—আছে কোথাও এখানেই, দেখছি আমি আর একবার ভালো করে।

দেবেশের গলায় হতাশ আতঙ্কের সঙ্গে আর একটা কী যেন সুর ফুে উঠছে।

সুরমা, সাহস দিয়ে বললো, চা-টা খেয়ে নিন। এখানেই আছে নিশ্চয় যদি রাস্তায় না পড়ে গিয়ে থাকে।

—রাস্তায় তো পড়ার কথা নয় বৌদি। সুটকেশেই ছিল।

সুরমাও দেখলো, একবার দু-বার তিনবার। শেষ পর্যন্ত সেও যখন হা ছেড়ে দিল তখন দেবেশ করুণভাবে হেসে বললো, নেই বৌদি, থাকে পাওয়া যেতো এতক্ষণ।

—কিন্তু আপনি যে বলছেন, ছিল। তাই তো ভাবছি—

যে চিন্তাটা চাপা দেবার চেষ্টা করছে দেবেশ, সেটাই বার বার ভে উঠছে জলের ওপর এতটা দুরন্ত বলের মতন।

সুরমা বললো, আশ্চর্য তো। বাড়ি থেকে, বাক্স থেকে, কোথায় যা

টাকাটা ?

দেবেশ যেন আপন মনেই বলছে, চোরের দয়া আছে বলতে হবে, এই টাকাগুলোও নিতে পারতো, নেয়নি। শুধু একশো টাকার নোটটাই নিয়েছে।

নলিনীর সাইকেলটা এসে বাইরে থামলো এই মুহূর্তে।

স্যুটকেশটা বন্ধ করে সুরমা কাঁপা গলায় বললো, দেখছি আমি, ছাড়া কাপড়ের সঙ্গে কোথাও পড়ে টড়ে গিয়ে থাকতে পারে।

—আছে কোথাও, নিশ্চয়ই আছে, বাড়ি থেকে কোথাও যায়নি।

ঠাণ্ডা একটা হাসি হেসে আর একটা সিগারেট ধরালো দেবেশ।

রাত্রে সুরমা নলিনীকে বললো, কাল মাইনে আনার সময় একটা একশো টাকার নোট এনো তো।

ক্রসওয়ার্ডের একটা ক্লু ভাবছিল নলিনী, অন্যমনস্কভাবে বললো, হুঁ। তারপর খেয়াল হতে বললো, কি বললে তুমি ? একশো টাকার নোট ? টাকা-পয়সা জমাচ্ছো নাকি আজকাল ?

সুরমা ঠোঁট চেপে বললো, দরকার আছে।

ওর গলার স্বর চমকে উঠলো নলিনী। মুখটা টেনে নিয়ে বললো, একি, কাঁদছ তুমি ? কী হয়েছে ? এই ?

সুরমা সত্যিই কেঁদে ফেললো এবার। স্বামীর কাছে কী লুকোবে সে ? চোখ মুছে আস্তে আস্তে বললো বিকেলের ঘটনাটা।

স্তম্ভিত হয়ে নলিনী বললো, দেবু সন্দেহ করছে ? তোমাকে ?

কান্নাভেজা গলায় সুরমা বললো, জানি না। কিন্তু আমাদের বাড়ি থেকে টাকা চুরি গেছে এ অপবাদ আমি কিছুতেই সহ্য করবো না।

একটু চুপ করে থেকে নলিনী বললো, টাকাটা ফেরত দেবে ভাবছ ? কিন্তু কেমন করে দেবে ?

সুরমা বললো, সে যেমন করে হোক্ দেবো আমি। বলবো চৌকির তলায় পড়ে গিয়েছিল হয়তো কোট খোলার সময়।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে নলিনী বললো, চুরি না করেও চোরের সাজা নেবে ? তারপর একমাস চলবে কী করে ?

সুরমা বললো, এখন তো দিয়ে দিই। পরে তুমি দু-গাছা চুড়ি বিক্রি করে দিও বরং। এমনিও তো কুলিয়ে উঠতে পারছি না।

নলিনী বললো, যা ভালো বোঝো করো তুমি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে এ অন্যায়। চুরির চেয়েও বেশী অন্যায়।

চুপ করে রইলো সুরমা।

পরদিন সীমন্তর বাড়ি থেকে দেবেশ ফিরলো রাত দশটার পর।

দরজা খুলে দিয়েই সুরমা বললো, আপনার টাকাটা পাওয়া গেছে, ঠাকুরপো।

পাওয়া গেছে! সেকি! অবাক হয়ে গেল দেবেশ।

সুরমা ঘরে ঢুকে বললো, দুপুর বেলায় ঘর পরিষ্কার করছিলাম, চৌকিটা সরাতে গিয়ে দেখি জঞ্জালের সঙ্গে পড়ে রয়েছে।

ব'লে নোটটা এগিয়ে দিল।

নোটটা ফিরিয়ে দিয়ে স্তম্ভিত দেবেশ বললো, এ টাকা তো আমার নয় বৌদি, এ তো নতুন নোট—আমারটা পুরোনো ছিল। সীমন্তর বাড়িতে পড়ে গিয়েছিল, আজ ফেরত দিল। এই তো।

ফেরৎ পাওয়া টাকাটা হাত বাড়িয়ে নেবার ক্ষমতাটুকুও হারিয়ে ফেলেছে সুরমা। চুরির চেয়েও অন্যায় কাজ করেছে সে।

দেবেশ যখন নীচু হয়ে প্রণাম করলো, কুণ্ঠিত গলায় বললো, আপনার কাছে আমার অপরাধের সীমা নেই বৌদি, তখন সুরমা পিছিয়ে যেতে পারলো না প্রথম দিনের মতো। শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো টাকাটার দিকে।

মেঘের পরে মেঘ

সেন সাহেব যখন বাড়ি ফিরলেন তখন রাত্রি সাড়ে বারোটা।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই নজরে পড়ল রজতের ঘরে আলো জ্বলছে। সাধারণতঃ এসময় একটা নীল আলো জ্বলে। রজত ঘুমোয় অথবা হয়ত ফেরেই না তখনো। লক্ষ্য করেন না।

থমকে দাঁড়ালেন। মনে পড়ল ক'দিন ধরে ব্রেকফাস্টে আসতে দেরী করছে ছেলেটা। দু দিন ধরে দেখাই হয় নি। আজও সকালে অপেক্ষা করতে করতে উঠে যেতে হয়েছিল। মালহোত্রার সঙ্গে য়্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল সাড়ে ন'টায়। অফিসে অবশ্য ফোনে একবার কথা হয়েছিল। রজত দুঃখপ্রকাশ করেছিল দেখা হচ্ছে না বলে। কী যেন হয়েছে ছেলেটার। ওর সঙ্গে কথা বলা দরকার।

সেন সাহেব পা বাড়ালেন রজতের ঘরের দিকে।

—হ্যালো রজত, কী করছ এত রাত পর্যন্ত? এখনি ফিরলে?

রজত ডিভানে গা এলিয়ে শুয়েছিল। সামনে কাঁচের টেবিলে একটা হোয়াইট হর্সের বোতল, দুটো সোডা, একটা গ্লাস। অর্ধেকটা ভর্তি।

চোখ তুলে বলল, হ্যালো ড্যাড্। ওয়েলকাম ওল বয়। বোসো— একটা সোফা দেখিয়ে দিল। ওয়েলকাম। হ্যাভ্ এ ড্রিংক।

বোতলটা টেনে নিল রজত। সেন সাহেব দেখলেন হাত কাঁপছে।

অপ্রকৃতিস্থ ছেলেকে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়েছিলেন সেন সাহেব। তবু চলে যেতে পারলেন না। সোফায় বসতে বসতে হাত দিয়ে ইশারা করে বললেন, ওহ নো, থ্যাংকস্, রজত। আমি এইমাত্র—

রজত বোতলটা খোলার চেষ্টা করতে করতে বলল, হাউজ্ দ্যাট? নীরেন সেন রিফিউজিং এ ড্রিংক—হা-হা ফানি! নীরেন সেন মদ ফিরিয়ে দেবে—শ শ্। তা হয় না বাবা, বেয়ারা—

বেয়ারাটা এসে দাঁড়ালো। সেন সাহেব ওকে চলে যেতে ইশারা করলেন—আমি এত রাত্রে আর খাব না, রজত। তুমিও বন্ধ কর এবার। ইউ আর

অলরেডি আউট, মাই বয়।

রজতের বোতলটা ছিনিয়ে নিলেন। —আর না রজত। ইউ হ্যাভ হ্যাড এনাফ।

চেষ্টা করে উঠে বসলো রজত।

—তুমি আজ মজার কথা বলছ, বাবা। এত রাতে খাব না—হ্যাভ হ্যাড এনাফ। ড্রিংকের কী যথেষ্ট হয় কখনো? যত খাবে তত আরো ইচ্ছে করবে—যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে।

কী বিশ্রী দেখাচ্ছে রজতকে। চোখের নীচে পাউচ, তার নীচে কালো দাগ। চোখ দুটো লাল ফোলা-ফোলা।

সেন সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।—শুয়ে পড়ো রজত। বেয়ারা—

আবার বেয়ারাটা এসে দাঁড়ালো। এবার রজতই ফিরিয়ে দিলো ওকে। —তুমি ভাবছ আমি আউট হয়ে গেছি? নাঃ। আমি এখনও চার পেগ্ স্ট্যান্ করতে পারি। দেখবে? কিন্তু না, তুমি যখন বলছ, তখন খাব না। আফটার অল ইউ আর মাই ফাদার।

বাবাকে উঠতে দেখে রজতও উঠে দাঁড়াল। টলছিল, কিন্তু পড়ে গেল না।

—সী? কিন্তু তুমি যেন কিছু বলতে চাইছিলে বাবা। স্বচ্ছন্দে বলতে পার। আমার ঠিক জ্ঞান আছে—ফুলি ইন কণ্ট্রোল অব মাই সেন্সেজ। প্লীজ, বাবা। প্লীজ সিট ডাউন। আই ওয়াণ্টা টক্। দেখছ তো এখন ছাড়া আমার সময় নেই। আজকাল ভোরে উঠতে পারি না। স্লীপ লাইক এ লগ্—প্লীজ ড্যাড, গিভ মি কম্প্যানি।

জড়িয়ে যাচ্ছিল রজতের কথা। কিন্তু অর্থহীন প্রলাপ নয়। আবার বসলেন সেন সাহেব।—অন্ কণ্ডিশন্, তুমি একটা লেমন স্কোয়াশ খাবে, মাথাটা ধুয়ে নেবে। আই ওয়াণ্ট টু টক্ টু ইউ। লাইক ফ্রেণ্ড্স। তোমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করতে চাই।

—ও কে ড্যাড্।

রজত মাথা ধুয়ে এল। এক গ্লাস স্কোয়াশ খেল নিজেই বার করে।

—য়্যাম আই নট্ এ গুড বয়?

সিগারেট ধরালেন সেন সাহেব।

—ইয়েস, ইউ আর। কিন্তু এটা ঠিক নয় রজত। তুমি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছ। ইউ আর কিলিং ইওরসেল্ফ। এত বেশি ড্রিংক করা—

তো লেমনও রেখেছি।

—কিন্তু এরকম করার মানে কি রজত? একটু আধটু পার্টি টার্টিতে ঘুরলে তো পার। এরকম একা একা ঘরে বসে—ইউ মাস্ট বি ফিলিং লোনলি।

—কোয়াইট, ড্যাড। লোনলি ইজ দ্য ওয়ার্ড। বড্ড একা লাগে আমার। মদ আমাকে সঙ্গ দেয়। এ গুড কম্পানি।

মাথা নাড়লেন সেন সাহেব। —ওহ্ নো। দ্যাটস্ এ ব্যাড কম্প্যানি। তুমি—আই মীন—হোয়াই ডোণ্ট ইউ হ্যাভ এ গার্ল?

শেষের কথাটা শুনলই না বোধ হয় রজত। হেসে উঠল—ড্রিংক এ ব্যাড কম্প্যানি! তোমার মনে আছে বাবা, তুমিই আমাকে হাতে ধরে শিখিয়েছিলে? বলেছিলে, দ্যাট্ উইল গিভ্ ইউ কম্প্যানি?

মনে পড়ল। কিন্তু সে অন্য এক অবস্থায়। সেন সাহেবের ভ্রূ-দুটি কুঁচকে উঠল—আমি অস্বীকার করছি না, রজত। তখন ঐ মেয়েটাকে ভোলাবার জন্য আমি ড্রিংক্স সাজেস্ট করেছিলাম।

রজতের চোখ দুটো কুঁচকে ছোট হয়ে গেল।

—সাজেস্ট নয় বাবা। ইউ রাদার ফোর্সড মি। বাধ্য করেছিলে। টিন্ড মিট্ ফ্রুট্ এণ্ড ড্রিংকস্। তুমি আমাকে সাতদিন ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলে। এণ্ড দেন ইউ ব্রেনওয়াশড মি, উইথ এ গার্ল। হা-হা।

সেন সাহেব একটু বিচলিত হলেন। রজত ঠিক প্রকৃতিস্থ নয়। এ অবস্থায় রজতের সঙ্গে কথা বলতে আসা ভুল হয়েছে। কোথায় তিনি দুটো কথা বলতে এসেছিলেন আর উল্টে রজতই শুনিয়ে দিচ্ছে। মজাটা হচ্ছে তিনি নিজে প্রতিবাদ করতে পারছেন না। জোর পাচ্ছেন না। তাঁর ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলেছেন না কি?

রজত!

আবার ডিক্যাণ্টারে হাত দিয়েছে রজত।

—প্লীজ ফাদার। তোমাকে কথা দিচ্ছি, বেশি না। নাও বাবা—টু ইউর হেল্থ, এণ্ড মাই কলেজ ডেজ।

দুটো পেগ ঢেলেছে রজত। সেন সাহেবকে নিতে হলো। হয়তো এই এক পেগে জড়তাটা ভাঙবে। একটু যেন ব্যক্তিত্ব ফিরে পেলেন সেন সাহেব।

—লেট আস বি ফ্র্যাংক রজত। তখন যা বলছিলে —আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই মানবে—সবই তোমার ভালর জন্ত।

রজতের ছোট ছোট চোখদুটো সিগারেটের ধোঁয়ায় টলটল করছিল। প্রায় আধবোজা আড়চোখে তাকিয়ে বললো—মাইণ্ড য়্যানাদার ? মনে করছি ছাত্রজীবনের কথা। আই নীড য়্যানাদার পেগ।

সেন সাহেব বলে যাচ্ছিলেন নিজের কথা। কোন জবাব দিলেন না। রজত বুঝল আপত্তি নেই। আবার দুটো পেগ ঢাললো।

সেন সাহেব বললেন, ওই রেণু মেয়েটা, তোমার ক্লাস-ফ্রেণ্ড, কোন্ পথে তোমাকে নিয়ে যাচ্ছিল ভেবে দেখ ত।

রজত গ্লাসে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, টু য়্যানাদার ওয়ার্ল্ড বাবা। অন্য জগতে। এই সমাজ, স্বাচ্ছন্দ্য, তোমাকে সব কিছু ছেড়ে যেতে হত—

—একৃজাকৃটলি। দেখো রজত, মেয়েটা যদি অন্য যে কোন মেয়ের মত হতো, কিছু টাকা চাইতো, অথবা তুমি জাস্ট এনজয় করতে চাইতে—আমি আপত্তি করতাম না। আমি এসব বিষয়ে খুব উদার। জাতটাত আমি মানি না। ও যদি আমাদের সার্কলের কেউ হতো তা হলে আমি আপত্তি করতাম না। এমন কি মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও, না হয়—কিন্তু তা তো নয়। যখন দেখলাম তোমাকে চাষী-মজুর-বিপ্লব-ইনকেলাব শেখাচ্ছে, দেন আই ডিসাইডেড টু ইণ্টারভিন। কিন্তু এভাবে তো চলতে পারে না। ইউ আর ইয়ং। ইউ মাস্ট সেটল ডাউন। মানে আমি বলছি—

গ্লাসটা শেষ করে রাখতে গিয়ে ফেলে দিল রজত।—সরি।

তুলতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সেন সাহেব তুলে বসিয়ে দিলেন। —নাউ রজত। ইউ মাস্ট স্টপ্।

—নো, আই ওয়ান্নাদা। আমি ফ্র্যাংক টক করতে চাই, বাবা। আই টেল য়ু ফ্র্যাংকলি, আরো এক পেগ চাই আমার। এতক্ষণে মুড আসছে। কী বলছিলে বাবা ? গ্যাল ! ডিড্নাই হ্যাব হ্যাড এনাফ্ ? থ্যাংকস্ টু ইউ ড্যাড। ড্রিংকের বেলায় এনাফ বলা যায় না—কিন্তু মেয়ের বেলায় আমি বলতে পারি। কোন মেয়েকেই আমার ভাল লাগে না, ডোণ্ট লাইক এনি অব্ দেম।

সেন সাহেব বল্লেন, ওহ রজত, বড্ড এলোমেলো বকছ তুমি। আমি বলছিলাম—না থাক। নাউ বয়, ইউ মাস্ট গো টু বেড। শুয়ে পড়ো এখন।

—হু? না? [illegible]

দিনের জন্য অন্ততঃ। তুমি জানো ড্যাড্, সাত বছরে আমি চল্লিশটা মেয়ের সঙ্গে মিশেছি। কিন্তু না, কেউই কম্পানি দিতে পারেনি আমাকে। আই মীন—কী বলে লোনলিনেস মানে আমার একাকীত্ব ঘোচাতে পারেনি—

সেন সাহেব অস্থির হয়ে উঠলেন।—আঃ রজত।

—লেম্মী স্পীক আপ ড্যাড। জানো, এত দেখেছি এত জেনেছি যে আয়াম ডিসগাস্টেড। আমি একটা সঙ্গিনী চাই ড্যাড্, এ গুড্ পার্মানেন্ট কম্প্যানিয়ন। এ হোল সিম্পল উওম্যান। হার মাইণ্ড, এণ্ড সোল। আয়াম হাংরি—রেস্টলেস। কিন্তু ভয় হয়, তুমি যদি মত না দাও। আমি পারি না বাবা—সেই জন্যই মদ খাই।

সেন সাহেব ওর পিঠে হাত রাখলেন।—ইউ আর সিলি রজত, লাইক এ মডলিন। টু সেন্টিমেন্টাল। নাউ, নাউ, যে কোন মেয়ে তোমার পছন্দ হয় তুমি বিয়ে করতে পার। আমি কি বলেছি আমার মতামতে তোমাকে চলতে হবে? এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার রজত। আমি শুধু চাই—বি সেট্লড। রেজ এ ফ্যামিলি। সত্যি বলতে কি রজত, আমি নিজেও লোন্লি ফীল করছি। তোমার মা চলে যাওয়ার পর থেকে—

—রিয়েলি, ফাদার? উঠে বসল রজত। বাবাকে দেখল, যেন নতুন বিস্ময়কর কিছু দেখছে।

সেন সাহেব বললেন, হ্যাঁ রজত। আমি তোমাকে সুখী দেখতে চাই। ওয়ান্ট টু হ্যাভ সাম কিডিজ য়্যারাউণ্ড মি। বড় ফাঁকা লাগে।

রজত যেন অন্য কিছু চিন্তা করছিল। বলল—তুমি ঠিক বলছ বাবা? যাকে খুশী আমি বিয়ে করতে পারি? এনি গার্ল আই লাইক?

—ইয়েস, মাই বয়।

হঠাৎ মাথাটা দু হাতে ধরে কেঁদে উঠল রজত।—আমাকে কাল তুমি এ কথা বলো নি কেন বাবা?

—হোয়াই? হোয়াটস্ দ্য ম্যাটার, রজত? কী হয়েছে কি?

—সে মেয়েটা নেই বাবা। শী'জ ডেড।

—কে? কার কথা বলছ?

—দ্য ওন্লি গার্ল হু হ্যাড এ সোল। যাকে আমি বিয়ে করতে পারতাম।

—কে সে? কেন আমাকে বলো নি আগে? সেন সাহেব উত্তেজিত

মাথা তুলে রজত বলল, আমি তোমাকে ভয় করি বাবা।

—কিন্তু কে সে? তোমার সেই পুরোনো ক্লাসফ্রেণ্ডদের কেউ নয় তো?

রজত মাথা নাড়লো।

—তাহ'লে ভয়ের কি আছে? কে সে?

রজত দূরে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কী খুঁজতে লাগল।

—বলো, রজত।

রজত মাথা নাড়লো আবার—যেন কিছুতেই মনে আনতে পারছে না।

—কাম্, মাই বয়। ডোণ্ট বি সেন্টিমেণ্টাল। কত ভাল ভাল মেয়ে রয়েছে। বেছে নাও।

হঠাৎ নিজের সঙ্গে যেন সংগ্রাম করতে করতে ঝিমিয়ে পড়ল রজত। তারপর ফিস ফিস করে বলল, তুমি চেনো বাবা তাকে। ঝিলমিল, ঝিলমিল দাস।

লাফিয়ে উঠলেন সেন সাহেব।—মাই গড্, অরূপ দাসের মেয়ে, ঝিলমিল; ঝিলমিল। আর ইউ সিওর?······ইউ আর এ ড্যাম্ড ফুল রজত? আমি আপত্তি করব এ বিয়েতে? আর ইউ ম্যাড্?

রজত ঘুমিয়ে পড়ল নাকি? আঃ! রজত। রজত। —ঝাঁকুনি দিলেন সেন সাহেব।

চোখ তুলে তাকাল আবার রজত।

সেন সাহেব বললেন—তুমি কী পাগলের মত বকছিলে। ঝিলমিল ডেড্। কে বলেছে? স্বপ্ন দেখছো। ডেড্! ঝিলমিল মারা গেলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম। কাল রাত্রেও দেখেছি তাকে পার্টিতে। রজত, ওয়েক আপ্ মাই, বয়। তুমি জানো হাউ হ্যাপি আই য়্যাম। ম্যাডোনা ইঞ্জিনীয়ারিং-এর অরূপ দাস—ঝিল্‌মিল্। ওয়াণ্ডারফুল। এই তো চাই। অভিনন্দন জানাচ্ছি তোমাকে। দেড়টা বেজে গেছে, রাদার লেট। না হলে এখুনি আমি গিয়ে পাকা করে আসতাম। রজত, শুনছো?

করুণভাবে রজত হাসলো—তুমি অকারণে এত উত্তেজিত হচ্ছ বাবা। জানো ঝিলমিল আয়ার মেয়ে!

—আয়ার মেয়ে? কী বলছ তুমি রজত? সেন সাহেব যেন হোঁচট খেলেন।

রজত বলল, আমি জানি বাবা, ঝিলমিল নিজে বলেছে আমাকে।

সেন সাহেব এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, কিন্তু লোকে তো ওকে অরূপ দাসের মেয়ে বলেই জানে। এবং আমি জানি ঝিলমিলই ইনহেরিট করবে ওঁর সম্পত্তি।

ঘাড় নাড়লো রজত—দ্যাট্‌স ট্রু।

—হোয়াই দেন? ইট্ ডাজ'নট ম্যাটার। আই ডোণ্ট মাইণ্ড। আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি দ্বিধা করছ কেন রজত? ডোণ্ট বি এ কাওয়ার্ড, মাই বয়। আফটার অল মেয়েটার তো কোন দোষ নেই।

রজত আর এক পেগ ঢেলে নিল। —এত লিবারাল তুমি? এত ভাল? আমি জানতাম না বাবা। জানলে হয়তো—

—কী হয়তো, রজত? ইট ইজ নট টু লেট ইয়েট।

—ইট ইজ ড্যাড্। ঝিলমিল বিষ খেয়েছে।

তড়িতাহতের মত চমকে উঠলেন সেন সাহেব—নো ইট কাণ্ট বি ট্রু। হোয়াই? ইউ ফুল, তুমি ফিরিয়ে দিয়েছ ওকে! ইউ স্পার্নড হার!

—ইয়েস্ ড্যাড, আই ডিড। আমি ভেবেছিলাম তুমি রাজী হবে না।

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাতে রজত স্তম্ভিত হয়ে গেল।

—ইউ ড্যাম্‌ড ফুল। ইডিয়ট্।

সেন সাহেব বার হয়ে যাচ্ছিলেন। হাত বাড়িয়ে কোটটা চেপে ধরল রজত। —শুনে যাও বাবা, কেন ভয় পেয়েছিলাম।

সেন সাহেব ভয় পেলেন। মাতাল রজত চড় খেয়ে হিংস্র হয়ে উঠেছে। গলায় জোর এনে বললেন, ছাড়ো, ছেড়ে দাও, মাতলামি কোরো না। শুনতে চাই না আমি।

রজত ছাড়ল না। একটা ধাক্কা দিয়ে বাবাকে বসিয়ে দিল সোফায়। —শুনতেই হবে তোমাকে। কেন আমি রাজী হইনি জানো? তুমি, তুমি ওকে—

গর্জে উঠলেন সেন সাহেব। —দ্যাট্‌স এ লাই। মিথ্যে কথা।

দাঁতে দাঁত চেপে রজত বলল, দ্যাটস নট্ এ লাই। দ্যাট মেড হার টেক পয়জন। তোমার জন্যে তাকে বিষ খেতে হয়েছে বাবা।

কাঁপছেন সেন সাহেব। সত্যি? দ্যাট সিলি গার্ল—!

—আমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। আর তুমি ওকে—

আত্মরক্ষার ভঙ্গীতে হাত তুললেন সেন সাহেব। —আমি জানতাম না রজত। বিশ্বাস করো। আমি কিছু করিনি, শুধু একদিন টিপসি অবস্থা ওদের বাড়ীতে, ভুল করে, অন্ত কেউ মনে করে বারান্দায়—এক্সকিউজ মী রজত। আমি ক্ষমা চাইছি এক্সট্রিমলি সরি—

হায়েনার মত হাসছে রজত। —তবু তুমি রাজী ছিলে বাবা! ঝিলমি আমার মেয়ে—ঝিলমিলকে তুমি কিস্ করেছ, তবু তুমি রাজী ছিলে আমা সঙ্গে বিয়ে দিতে! হাউ গ্রেট ইউ আর! কী মহৎ—উদার। ছেলের জন্ত কী স্যাক্রিফাইস—!

সেন সাহেব মাথা নীচু করে বসে রইলেন।

হঠাৎ বসে পড়ল রজত। —না, বাবা। ঝিলমিল নয় সে। ঝিলমি নয়। রেণু, রেণু। আই মেড এ মিসটেক। রেণু বিষ খেয়েছিল। রেণুকে তুমি আমার মন থেকে মুছে ফেলার জন্ত এই বাড়িতে, এই ঘরে—যখন সে আমার কাছে ছুটে এসেছিল। আমি পারি নি ওকে বাঁচাতে। আমি তখ তো তালাবন্ধ ও ঘরে মদে ডুবে আছি। নিরুপায়, গরীব মধ্যবিত্ত ঘরে মেয়েটা—সেই বোকা আদর্শবাদী মেয়েটা—সে তো রেণু।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন সেন সাহেব। —গুড গড্। ঝিলমিল নয় আমি জানি তুমি ভুল করেছ, ঝিলমিল কেন বিষ খেতে যাবে? ওহ, রজত তুমি যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে।

ঝিলমিল আছে। ঝিলমিল মরেনি। এখনো আশা আছে। রজতকে ঠিক ম্যানেজ করা যাবে। এ সিলি সেন্টিমেণ্টাল বয়।

রজত ভাবছে রেণু আর ঝিলমিল কী ক'রে এক হয়ে গিয়েছিল এতক্ষণ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না! রেণুর মত ঝিলমিলও কি ঘৃণা করে ওর বাবাকে? এই সমাজটাকে? তাই কি? কে জানে।

তিন বন্ধু

অফিসের ছুটির পর সেণ্ট্রাল এভিনিউ দিয়ে হাঁটছিলাম। বৌবাজার স্ট্রীট থেকে বাস ধরে মানিকতলা যাব। হঠাৎ ট্রাফিক সিগন্যালের মুখে আমার পুরোনো নাম ধরে কে ডাকল।

এপারে এসে দাঁড়ালাম, বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছি, কাউকে চিনতে পারছি না, হঠাৎ দেখি লাল রঙের একটা গাড়ীর ভেতর থেকে মুখ বাড়িয়ে একজন আমাকে ডাকছে—রাস্তার বাঁদিক থেকে। রাস্তাটা ফাঁকা হতে মিনিট দুয়েক লাগল। তারপর ওপারে গেলাম।

চিনতে পারলাম। সত্যেন।

প্রায় চৌদ্দ বছর পরে ওর সঙ্গে দেখা হলো আবার।

বলল, কোথায় যাচ্ছিস? উঠে আয়।

বললাম, আমি এখানেই যাব, কাজ আছে একটু।

সত্যেন বলল, রাখ্ তোর কাজ। কতদিন দেখা হয়নি বলতো।

হাত ধরে টেনে গাড়ীতে ওঠাল সত্যেন।

কলেজ স্ট্রীটে এসে বড়দার কেবিনের দিকে দু'জনেরই নজর গেল আমাদের। সত্যেন বলল, যাবি? চল্, এখানেই ঢুকি. কতদিন যাইনি।

প্রায় কুড়ি বছর পরে আমরা বড়দার কেবিনে ঢুকলাম।

আমাদের পুরোনো আড্ডার সেই কোণের টেবিলটা খালি ছিল। সেখানেই বসলাম আমরা। মনে পড়ল জয়দেব বসতো ঠিক রাস্তার দিকে মুখ ক'রে। মাঝে মাঝে জয়দেব এক বন্ধুকে আনতো, তার নামটা ভুলে গেছি। সে এলে আরেকটা চেয়ার আনানো হতো। জয়দেবের মুখোমুখি পাতা হতো।

এদিক ওদিক তাকিয়ে সত্যেন বলল, দেখছিস সেই ট্রাডিশন এখনো চলেছে। সেই পাথরের টেবিল। বোতলের ভাসে কাগজের ফুল। আলমারির মধ্যে ক'খানা প্লেট, টীপট. সেই আধময়লা উর্দিপরা বেয়ারাগুলোর কাঁধে গামছা। একটুও বদলায়নি। অথচ পার্ক স্ট্রীট এসপ্ল্যানেডের রেস্টুরেন্টগুলো

দেখেছিস কী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! সবই বদলে গেল। এরাই, মানে এই উত্তর পাড়াটা, বদলালো না। সেই জন্যে উন্নতিও হয় না।

হঠাৎ বড়দাকে দেখা গেল। ওঁর বড় উঁচু চেয়ারটাতে তেমনি নির্বিকার-ভাবে পান চিবোতে চিবোতে এসে বসলেন। চেহারা প্রায় তেমনি আছে, শুধু চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে। একটা নমস্কার করলাম আমরা। বড়দা ভ্রূক্ষেপ করলেন না। কৃত্রিম আপ্যায়নের ভঙ্গিতে মাথাটা শুধু হেলালেন একটু। বুঝলাম চিনতে পারেননি

না পারারই কথা। তিন বছর ধরে আমরা তিনজন দিনের পর দিন আড্ডা দিয়েছি সত্যি। কিন্তু তারপর তো কুড়ি বছর কেটে গেছে। কত নতুন খদ্দের এসেছে, হয়তো আড্ডা দিয়েছে, এখনো দিচ্ছে। আমাদের কথা মনে রাখবেন বড়দা এটা আশা করাই অন্যায়।

তবু মনে মনে আহত হলো সত্যেন। বলল, চিনতে পারল না আমাদের! অথচ তখনকার দিনে আমরাই ছিলাম এ দোকানের সব চেয়ে বড় খদ্দের। আধবুড়ো একটা বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। অনেক দিনের চেনা ভঙ্গিতে সেলাম করে বলল, কী দেব বলুন।

সত্যেন মেনু কার্ডে চোখ বুলিয়ে সবচেয়ে যা দামী এ রেষ্টুরেণ্টে তাই অর্ডার দিল। মাথা নুইয়ে চলে গেল বেয়ারা।

একটা সিগারেট ধরিয়ে সত্যেন বলল, কোথা আছিস এখন, কী করছিস? খবর বল তোর। উঃ, কতদিন পরে দেখা। প্রায় দু যুগ পরে, না?

বললাম পঞ্চাশ, সালে এসপ্ল্যানেডে দেখা হয়েছিল, ভুলে গেলি।

সত্যেন লজ্জিত হলো। সেবার ও অন্য এক বন্ধুর সঙ্গে যাচ্ছিল কোথাও। কথা বলার সময় হয়নি। চট্‌ করে একখানা কার্ড বার করে বলেছিল, অফিসে যাস একদিন। পরে দেখা হবে, একটু ব্যস্ত আছি এখন।

এই সত্যেন গ্রামের স্কুল বোর্ডিং-এ আমার সঙ্গে এক ঘরে চার বছর কাটিয়েছে। তারপর কলকাতায় এসে অন্য পাড়ায় থেকেও রোজ আড্ডা দিতে এসেছে আমার কাছে। ক্ষুণ্ণ হয়েছিলাম সেই সত্যেন এড়িয়ে গেল আমাকে! হয়তো সেই শীতের বিকেলে আমার পুরোনো র‍্যাপারখানা আমার অবস্থা প্রকট করে দিয়েছিল সত্যেনের কাছে।

সেই সত্যেনকে আজ লজ্জিত দেখে মনে মনে খুশী হলাম।

সত্যেন বলল, ও হ্যাঁ। কিন্তু তুইতো দেখা করলি না তারপর। আর

আমিও ভুলে তোর ঠিকানাটা নিইনি। কী করছিস এখন বল।

বললাম, কী আর করব, কেরাণীগিরি।

সত্যেন অবাক হয়ে গেল, কী বলছিস তুই? ইউনিভার্সিটির স্কলারশিপ পাওয়া ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে, তুই করছিস কেরাণীগিরি?

আমি হাসলাম। সত্যেন আমার হাসির অন্য অর্থ করল। বলল, ঠাট্টা করছিস নিশ্চয়ই? মানে কোন ফরেন ফার্মে ঢুকেছিস বোধ হয়।

ঘাড় নাড়লাম।—বিশ্বাস না হয়, দেখে আসিস একদিন, সেঠিয়া এণ্ড কোম্পানী, এই নে ঠিকানা।

খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল বেয়ারাটা।

এক মুহূর্ত চুপ করে রইল সত্যেন। তারপর বলল, অথচ তুই খবর দিস্‌নি আমাকে। অবশ্য আমারও অন্যায়, তোর খবর নিতে পারিনি। নে শুরু কর, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

অনেকদিন পরে চিকেন কাট্‌লেট খেতে খেতে মনে পড়লো বড় ছেলে একদিন স্কুলের মাইনের ফেরৎ টাকা দিয়ে চিকেন কাট্‌লেট খেয়ে এসেছিল বলে পরের দিন টিফিন দেয়নি শিবানী।

সত্যেন বলল, কি রে, কী ভাবছিস? আর সব খবর কী তোর বল। শেষ পর্যন্ত কেরাণীগিরিতে ঢুকলি কী করে?

বল্লাম, আমার কথা বাদ দে। গরীবের ছেলে, চাকরীর দরকার ছিল। যা পেলাম সামনে তাই নিলাম। আমাদের কী আর বাছাবাছি করা চলে। তুই কী করছিস বল্‌।

সত্যেন বলল, প্রথমে একটা ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে সুপারভাইজার পোষ্টে ঢুকে ছিলাম। তারপর এখন ব্যবসা করছি। মামাকে তো মনে আছে তোর। মামার এক বন্ধুর ফার্মে কিছু শেয়ার কিনেছিলাম। তারপর ফিফ্‌টিতে মামা বললে, দারুণ একস্‌প্যানসনের স্কোপ রয়েছে, মামার বন্ধুর টাকা নেই, তখন চাকরী ছেড়ে নেমে পড়লাম। এখন ডিরেক্টার হয়েছি। ম্যানুফ্যাকচারিং শুরু করেছি গত বছর। বেলেঘাটার দিকে কারখানা, সেখানে যাব বলেই বেরিয়েছি।

খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। বেয়ারাটা প্লেটগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেল।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে সত্যেন বলল, কিন্তু তুই কেরাণীগিরি করছিস শুনে মনটা খারাপ হয়ে গেল। একটা প্রফেসারী তো পেতে পারতিস তুই।

অন্তত এর থেকে তো ভাল।

বললাম, এম, এ. দিতে পারলাম কই!

—সেকি, এম· এ. দিস নি?

বললাম, কই আর দিতে পারলাম। বাবা মারা গেলেন। হঠাৎ সংসারটা ঘাড়ে এসে পড়ল। যা পেলাম তাই খুঁজে নিলাম।

—কত পাস্?

—তিন শো পঁচিশ।

সত্যেন বলল, মাই গড্। আমার একটা ফোরম্যানই তো সাড়ে তিনশো টাকা রোজগার করে। একটা ভদ্রলোকের পকেট খরচই তো আজকালকার দিনে তিনশো। ওতে চলে তোর?

—চালাতে হয়। উপায় কি বল্। টিউশনি করি দুটো।

সত্যেন বলল, কী আশ্চর্য! তোর মত ছেলের এই অবস্থা। কোথায় আমি ভাবতাম আই· সি· এস. কি অন্তত বড় এটর্নী, ব্যারিষ্টার হবি।

—স্কুলের মাষ্টার মশাইরাও তাই বলতেন। আমি নাকি নাম করবো। বিখ্যাত একজন হব। কলেজে পড়ার সময় আমি নিজেও এই কথা ভাবতাম।

একটু চুপ করে থেকে সত্যেন শুধাল, আর জয়দেব? বিপ্লবীটার খবর কী? অমন কেরিয়ারটা হুজুগে মেতে নষ্ট করল। বড় কিছু নিশ্চয়ই হয়নি? এম. পি· এম· এল. এ হলে তো নামটা নজরে পড়তো। জানিস কিছু তুই? কী করছে? মতিগতি বদলেছে আশা করি।

জয়দেবের খবর আমিও রাখি না। বললাম, সেই যে বিয়াল্লিশ সালে হোষ্টেল থেকে উধাও হল আর খবর পাইনি। মাঝে একবার শুনেছিলাম জেলে গিয়েছিল।

সত্যেন বলল, কী আশ্চর্য দেখ্‌তো। ম্যাট্রিকে টেন্‌থ, আই, এস, সি,তে থার্ড, সেই ছেলে কেরিয়ার ফেলে হুজুগে মেতে সর্বনাশ করল নিজের।

জয়দেবের প্রসঙ্গে মনটা খারাপ হয়ে গেল। চুপ করে রইলাম। নিজেকে অপরাধী মনে হল। সত্যেনের উপর রাগ করছিলাম অথচ আমিও তো জয়দেবের খবর নিইনি।

পাশের টেবিলটা খালি হয়ে যেতে আধবুড়ো বেয়ারাটা আবার এসে দাঁড়াল। হেসে বলল, আমাকে চিনতে পারছেন না বাবু? আমি কালিপদ।

মুখ তুলে তাকালাম। বেয়ারাটা এতক্ষণ একটা উর্দিপরা যন্ত্র মাত্র ছিল।

এবার দেখলাম একটা মানুষ। কালিপদ মণ্ডল। সেই ছোকরা বয় কালিপদ বড় হয়ে আধবুড়ো বেয়ারা হয়েছে।

হেসে বললাম, তাই তো তুমি যে বুড়ো হয়ে গিয়েছ কালিপদ, চিনবো কী করে? কিন্তু তুমি তো চিনতে পেরেছ ঠিক।

কালিপদ বলল, হ্যাঁ, বাবু, চিনেছি ঠিক। অনেকদিন আসেন নেই আপনারা, তবু মুখটা মনে আছে।

শুধালাম, নাম মনে আছে আমাদের?

কালিপদ লজ্জিতভাবে বলল, না বাবু, আপনার নাম ভুলে গিয়েছি। তবে ওনার নাম মনে আছে, সতুবাবু, ওঁর নাম তো?

সত্যেন আমাদের কথা শুনছিল নিস্পৃহভাবে। এবার ওকে একটু খুশী দেখা গেল। বলল, তুমি সেই বয়ই রয়ে গেলে, কালিপদ।

চেনা লোক পেয়ে খুব খুশী কালিপদ, পাশের টেবিলে লোক এসেছে। ওরই খাবার কথা, গেল না। ইশারা করে আর একজনকে যেতে বলল। কালিপদ একটু গল্প করতে চায়।

সত্যেন বলছিল, কত বদলে গেল চারদিকে। তোমরাই বদলালে না। তেমনি রয়ে গেলে।

কালিপদ বলল, তেমনি আর কই বাবু। দেখছেন না, চুল পেকে গিয়েছে।

হঠাৎ কী মনে পড়ল কালিপদর। বলল, আচ্ছা বাবু আপনাদের আর একজন, যিনি স্বদেশী করতেন। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা ছিল, খুব তর্ক করতেন। ওনার খবর কী?

আমরা দু'জনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। একটু অস্বস্তি বোধ হল। একটা বেয়ারা জয়দেবের কথা মনে রেখেছে, আর আমরা ভুলে গেছি আমাদের অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা।

বললাম, ওর খবর তো অনেকদিন পাইনি। তুমি জান নাকি?

কালিপদ বলল, পনের ষোল বছর আগে দেখা হয়েছিল। তারপর মাঝে মাঝে দু একবার রাস্তায় দেখেছি, আজকাল আর দেখি না। খোঁড়া মানুষ তো। বোধ হয় এদিকে আর আসেন না।

দু'জনে আমরা এক সঙ্গে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম—সে কী? খোঁড়া হল কী ক'রে?

কালিপদ বলল, জানেন না আপনারা ? সেই সেবার কি স্বদেশী ব্যাপারে গুলি চলল ধর্মতলা ষ্ট্রীটে। ওঁর পায়ে লেগেছিল যে। তা আমি কি আর জানতাম, দেশের একটা লোককে দেখতে গিয়ে দেখি আমাদের সেই বাবু। অমন জোয়ান লোকটা বাবু, পা-টা কেটে দিয়েছে হাঁটু থেকে।

—তারপর ?

—তারপর বাবু, কলেজ ষ্ট্রিটে আগে আগে দেখতাম কেরাচ নিয়ে যাতায়াত করতেন ইদিক দিয়ে। দশ বছর আর দেখতে পাইনি।

সত্যেন আমার দিকে তাকাল। —দেখলি ? এমন একটা ব্রিলিয়াণ্ট ছেলে হুজুগে মেতে নষ্ট হয়ে গেল। ইস, কাটা পা নিয়ে কীইবা করবে আর।

আমাদের খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, সন্ধ্যার ভীড় বাড়তে শুরু করেছে। আমরা উঠে দাঁড়ালাম।

ফুটপাতে নেমে পড়েছিলাম। কালিপদ আবার বলল, ওই বাবুর খবর পেলে দেবেন বাবু। মনটা বড় টন্‌টন্ করে। স্বদেশী করতে গিয়ে খোঁড়া হয়ে গেল অমন ভাল শক্ত সমর্থ মানুষটা।

স্নেহনীড়

উৎসবোচ্ছল স্নেহনীড়েও শ্রান্তি নামলো একসময়। কন্যাযাত্রীদের পর বাড়ির লোকদের খাওয়া-দাওয়া চুকতে একটা, তারপর মেয়েরা গেছে বাসরের সুরভি-সন্ধানে আর এদিকে চলেছে অকারণ আড্ডা। হঠাৎ কার নজর গেছে দেয়ালঘড়িটার দিকে,—ঈস্ রাত যে ফুরিয়ে গেল, কাল আবার কুশণ্ডিকা, কন্যাবিদায় আছে। বাইশ জোড়া হাতে মাদুর সতরঞ্চি পড়েছে এখানে ওখানে, সিঁড়ির কোণে। যে যেখানে পেরেছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঠেলা-ঠেলি করে জায়গা করে নিয়েছে।

ঘুম নেমেছে ত্রস্ত পায়ে, অবসাদের ক্লান্তি নিয়ে।

যাদের জাগার কথা সকাল পর্যন্ত তাদের উৎসাহেও ভাটা পড়েছে তিনটে নাগাদ। হাই তুলতে তুলতে একে একে পালিয়ে এসেছে বীণা, রীণা, গীতা রুমীর দল। আর তারও ঘণ্টাখানেক পরে শেষ হয়েছে বেলা-অনিলের ফিসফিসানি। বাসর ঘরেও ক্লান্তি নেমেছে।

ঘুম নেই শুধু স্নেহলতার যাঁর নামে এই স্নেহনীড় উৎসর্গ করা হয়েছিল পাঁচ বছর আগে। আর নেই অমরনাথের যিনি কনিষ্ঠ কন্যাকে পাত্রস্থ করে সংসারে শেষ কর্তব্যটুকু সম্পন্ন করলেন।

সারা বাড়িটা নিঝুম হয়ে যাওয়ার পরও স্নেহলতা একবার ঘুরে ঘুরে দেখলেন কে কোথায় ঘুমিয়েছে, ভাঁড়ার ঘরে আর কলতলায় বাসনপত্রগুলির হিসাব নিলেন, তারপরে মনে পড়লো স্বামীর কথা। এখানে নেই। নীচে কোথাও নেই তিনি। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠলেন ভারী ভারী শ্লথ পায়ে।

ছাদের দরজার কাছে আসতে সাড়া এলো, কে?

মৃদু গলায় স্নেহলতা বললেন, আমি।

—ও, শোওনি এখনো?

জবাব দিলেন না স্নেহলতা, হাসলেন শুধু অন্ধকারে। তারপর কাছে এসে বসলেন, তুমিও শোওনি তো।

অমরনাথও হাসলেন বিষণ্ণ করুণভাবে, না ঘুম আসছে না।

কেন আসছে না সে কথা অজানা নয় স্নেহলতার। বেলার বিয়ে হয়ে যাওয়ার বেদনা নয়, আরো দুই মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তাঁরা, ঘরেও এনেছেন দুটি মেয়ে। সে জন্যে নয়। কাল না হয় পরশু, আবার ফিরে যেতে হবে তাঁদের সেই ম্যালেরিয়া-জর্জর নিস্তব্ধ ভাঙা বাড়িতে। এবার হয়তো বাকী জীবনটুকু সেখানেই কাটিয়ে দিতে হবে। স্তব্ধ নিঝুম তারা-টিপ আকাশের নীচে ষাটোত্তর দু'টি মানুষ বসে রইলেন পাশাপাশি। একজন এ বাড়ীর কর্তা। অপরজন স্নেহলতা, স্নেহনীড়ের গৃহিণী। অমরনাথ আর স্নেহলতা, এই বাড়ির পিছনে যাঁরা বরুনাময় তিরিশটি বছর ঢেলে দিয়েছেন শেষ জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের আশায়।

বাড়ি উঠেছে শেষ সঞ্চয় কুড়িয়ে, স্নেহলতার অলঙ্কার ভেঙে। কিন্তু সে বাড়িতে, স্নেহলতার স্নেহনীড়ে, স্থান নেই স্নেহলতার। জোর করে কেউ তাড়ায়নি তাঁদের, ছেলে-বৌরা কেউ অসম্মান করেননি মা-বাবার। উঠে যেতে হয়েছে তাঁদের নিজের ছেলেমেয়েদের স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে তাকিয়ে। ক'টি বছরই বা বাকী আর জীবনের? দুই বুড়ো-বুড়ীর জন্ত এতগুলি মানুষের অসুবিধা করতে মন চায়নি।

বুড়ো-বুড়ী? দু'জনের মনে একই সঙ্গে কথাটা উঠলো। দুজনেই হাসলেন। করুণ বিষণ্ন সলজ্জ হাসি। মনে পড়ল এই পাঁচ বছর আগে গৃহপ্রবেশের রাত্রিটির কথা।

ফ্লাওয়ার ভাসের ঝিমিয়ে আসা ফুলগুলো দিয়ে খেয়ালের বশে মালা গেঁথেছিলেন অমরনাথ, স্নেহলতা পরেছিলেন বিয়ের পুরোনো বেনারসীখানা। কী কী কথা হয়েছিল স্পষ্ট মনে আছে: স্নেহলতা বলেছিলেন, অমন করে তাকিও না বাপু এ বয়সে—

অমরনাথ বলেছিলেন, কেন? লজ্জা করে?

—করে না? ছেলেমেয়েরা বড় হয়নি?

ছেলেমেয়েরা বড় হলেই কি মা বুড়ী হয়? চুপি চুপি বলেছিলেন অমরনাথ। খুশি হওনি তুমি? শেষ পর্যন্ত একটা নিজের বাড়ী হল। তোমার নামে বাড়ি?

কৃত্রিম লজ্জায় খুশিখুশি স্নেহলতা বলেছিলেন, ছেলেমেয়েরা কী ভাবছে বলো তো? যদি দেখে ফেলে, হাসবে না মনে মনে মা-বাবার প্রেম দেখে? সেদিনও সারারাত্রি জেগে ছিলেন দু'জনে। কিন্তু আজকের মতো এমন

অন্ধকার ছাদের বিষণ্ণ নির্জনতায় নয়, সেদিন প্রায় আজকের মতই ওঁদের সাজানো ছিল ঘরটা, যেখানে বেলার আসর হয়েছে।

স্মৃতির সিঁড়ি ভেঙে অমরনাথ স্নেহলতা নেমে গেলেন।

রিটায়ার করে অমরনাথ চেকখানা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন ট্যাক্সি ক'রে। জায়গা পছন্দ করা ছিল আগেই। টাকার হিসেব দিয়ে প্ল্যান নিয়ে এলেন, স্নেহলতার অনুমোদনের জন্যে। সব কথাই মনে পড়ছে এখন।

সঁাথির কথা শুনে নাক সিঁটকেছিল প্রথমে সবাই। এই বেলাই বলেছিল, সঁাথি? আর জায়গা পেলে না তোমরা, মা? দেখিনি আবার? জঙ্গুলে জায়গা, পাড়াগাঁয়ের মত মশার ডিপো, নমিতাদিদের তো বাড়ি ওখানে। স্নেহলতা বলেছিলেন আর তো বাড়ী পাল্টাতে হবে না বারে বারে। এবার তোদের নিজেদের বাড়ী—

খুশি হয়েছিল শুধু ছোট ছেলে সরোজ। গাছপালার সখ তার, শ্যামবাজারের এঁদোগলির অন্ধকার কালি উঠোনে জায়গা ছিল না বাগান করার।

এখনো যেন গায়ে কাঁটা দেয় পুরনো বাসাবাড়িগুলোর কথা মনে পড়লে। বিয়ে হয়েছিল মাসীমার ছিটেবেড়ার একখানি ঘরে। স্যাঁৎসেঁতে মাটির দেওয়াল বেয়ে ভাপসা গন্ধ উঠছিল সালকের খোলা নর্দমার। টিনের চালে বৃষ্টির রিমঝিম গান গায়নি বাসর রাতেও, টস্ টস্ করে নোংরা জল পড়ে ভিজিয়ে দিচ্ছিল নতুন বিছানার একটা কোণ। বিছানাটা সরিয়ে নিতে হয়েছিল।

তারপর পার্টিশন-ঘেরা একখানা এঁদো ঘর। ও পাশের মত্ত প্রতিবেশীর আস্ফালন শোনা যেত রাত দেড়টায়, আর দিনের বেলায় জল নিয়ে বচসা। তারো পরে শ্যামবাজারের বাসায় যখন উঠে এসেছেন অমরনাথের মাইনে বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, তখন ছেলে-মেয়েরা বড়ো হতে শুরু করেছে, দু'খানা ছোট ছোট ঘরে দেয়াল থেকে দেয়াল পর্যন্ত বিছানা বিছিয়ে শুতে হয়েছে গাদাগাদি করে।

এ বাড়ীতে আসার পরে প্রথমে কী হৈ হৈ হয়েছিল। কে কোথায় শোবে, কার কোন ঘরটা চাই, তাই নিয়ে। চাকরি করে নরেন, বড় ছেলে। সে বললো, আমার কিন্তু আলাদা ঘর মা, মনে থাকে যেন। সবচেয়ে ছোটটাই দিও, কিন্তু আমার ঘরে অন্য কেউ থাকতে পারবে না। মেজ ছেলে কমলের গানবাজনার সখ, কিন্তু দাবি তার কম, কলেজে পড়ছে তখনো। সে বললো

আমাকে বরং বাইরের বারান্দাটা ঘিরে দাও। বাইরের ঘরও হবে তোমাদের। মিস্ত্রী খাটছে তখনো। যুক্তিটা মন্দ লাগলো না স্নেহলতার, তাই হল। কিন্তু তা হলেই কি জায়গা কুলোয়, গোটা বড় ঘরটা স্নেহলতার নিজের জন্যে রাখলে? সেখানে বেলাও থাকবে বৈকি। মাঝের ঘরটা হল সরোজের। ওর সঙ্গে আবার বেলার ঠিক বলে না। ভাগ্যিস বীণা রীণার বিয়ে শ্যামবাজার থেকেই হয়ে গিয়েছিল। তারপর ওরা জামাইরা এলে ত ওই সরোজের ঘরেই থাকবে।

মাস ছয়েক পরে ভবতোষ এসে ঘুরে গেল আর একবার, বীণা গেল না। বললো, কিছুদিন থাকি মা এখানে। সেই বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ি গেছি, মাসখানেক কখনো থাকিনি একসঙ্গে। খারাপ দেখায় না, কী বলো?

মাস তিনেক কাটিয়ে বীণা যদি গেল তো এসে পড়লো রীণা। বিয়ে হয়ে অবধি বাসার অভাবে পড়ে আছে পাড়াগাঁয়ে। ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে চেহারা হয়েছে হাড্ডিসার। ফিরে গিয়েছিল গৃহপ্রবেশের দিন চারেক পরে শাশুড়ীর অসুখের খবর পেয়ে। এসে বললো, রোগটা এবার তাড়িয়ে যাবো, মা। স্নেহলতা বললেন, বেশ তো থাক্‌ না ক'দিন।

শরীর সারলো আস্তে আস্তে। কিন্তু যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। অপরেশ আসতো প্রথম প্রথম ছুটিছাটার দিনে। ক্রমে তার আসাটা কমে এলো। হঠাৎ মাস দুয়েক পরে যাতায়াতটা আবার বেড়ে গেল তার, কিন্তু হাজার বললেও রাত্রে থাকবে না কোনদিন।

কিছুদিন পরে রীণা বললো, মা একটা কথা বলবো?

আজো স্পষ্ট মনে মনে আছে, স্নেহলতা বললেন, বল্‌ না কি বলবি। অত কিন্তু কিন্তু করছিস কেন! চলে যাবি?

রীণা বললো, চলে যেতেই তো বলছে ও, কিন্তু ভয় করছে মা। আবার সেই ম্যালেরিয়ার খপ্পরে গিয়ে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে মায়ের চুলগুলো হঠাৎ বাছতে শুরু করে দিয়েছিল রীণা—সব যে সাদা হয়ে গেল মা।

হাসলেন স্নেহলতা।—বয়স কি কম হল রে।

—ঈস্, কেউ বলুক তো দেখি তোমার বয়স কতো ঠিক করে, শুধু চুলই যা দু-একটা পাকছে।

কথাটা সত্যি। তার মাস ছয়েক আগেই তো গৃহ-প্রবেশের দিনটিতে আয়নায় তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন স্নেহলতা।

সে কথাটা উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, হ্যাঁ, কী বলছিলি তুই?

আঙুলে আঁচল জড়িয়ে মুখ নীচু করে বলেছিল রীণা,—বলছিলাম একখানা ঘর দাও না আমাদের।

ঘুরে বসে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলেন আবার স্নেহলতা—ও, এই কথা? বেশ তো থাকতে বললেই তো পারিস যে ক'দিন আছিস তুই। আমিও তো তাই বলছি, যে লাজুক ছেলে অপরেশ। থাকুক না কিছুদিন এখানে।

রীণা একবার মায়ের চোখের দিকে তাকিয়ে নিল আড়চোখে। তারপর বললো, তা নয় মা। সে ও থাকবে না কিছুতেই। বলছিলাম আমাদের একখানা ঘর তুমি ভাড়া দাও মা। তোমারও কিছুটা সাশ্রয় হয় আমাদেরও—

স্তম্ভিত স্নেহলতা বলেছিলেন,—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে খুকী? ঘর ভাড়া দেব তোকে! তোর আর বীণারই তো ঘর—তোরা কি পর হয়ে গেছিস বিয়ে হয়ে গেছে বলে?

রীণা এবার হাত দুটো জড়িয়ে ধরলো মায়ের।—না মা, আপত্তি কোরো না তুমি। আবার যদি গাঁয়ে ফিরে যেতে হয় মা, ঠিক বলছি এবার আর দেখতে পাবে না আমাকে।

স্নেহলতা বললেন, ছিঃ খুকী, নিজে মা হয়েছিস। জানিস না মাকে ওসব কথা বলতে নেই? থাকবি থাক, ভালো কথাই তো, কোন মা না চায় মেয়ে তার কাছেই থাকুক। কিন্তু ভাড়ার কথা তুলিস না মা।

রীণা বললো—না মা, থাকবো যখন ভাড়াও দেব আমরা। নইলে জামাই তোমার কিছুতেই রাজী হবে না। জানো তো ওকে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি মা—আপত্তি কোরো না।

স্নেহলতা বললেন, কী জানি মা। আমি তা পারবো না। তোর ভাইরা শুনলে কি বলবে ভেবে দেখেছিস—একে তো শোয়ার ব্যাপার নিয়ে কী ঝগড়া—

কেমন করে যেন বেরিয়ে গিয়েছিল কথাটা মুখ দিয়ে। রীণার রাগ দেখে মনে হল, বলাটা উচিত হয়নি।

রীণা বললো, ওঃ বুঝেছি। আমার জন্যে তোমাদের অসুবিধা হচ্ছে। এতদিন বলোনি কেন মা? আজ রাতের ট্রেনেই চলে যাচ্ছি।

সত্যি সত্যিই উঠে যাচ্ছিল রীণা, জোর করে বসালেন স্নেহলতা।—শোন খুকী, সে-কথা বলিনি আমি।

—বলোনি? বললে এইমাত্র।

শেষ পর্যন্ত কমল এসে ঠাণ্ডা করেছিল রীণাকে।

সেই থেকে রইলো ওরা। স্নেহনীড়ের তিনখানা ঘরের মধ্যে স্নেহলতার রইলো দু'খানা। ঘেরা বারান্দা ধরলে অবশ্য তিনখানা কিন্তু তাই বা রইল কোথায়? বছর না ঘুরতে নরেনের আর তার এক বছর পরেই কমলের বিয়ে দিয়ে বিদায় নিতে হল স্নেহলতাকে। ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ভাবেই ঘটে গেল।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায়, চাকরি পাওয়ার ঠিক মাস দুয়েক পরে, দেখা গেল কমলের আর গানে মন বসছে না, এদিক ওদিক ঘুরে একা খোঁজে মা-কে। শেষ পর্যন্ত রীণার সামনেই বলে বসলো, তোমরা কি ভেবেছ মা বলো দিকি। দাদার বিয়ে-টিয়ে দেবে না?

স্নেহলতা বললেন, দেব না কেন? দেখা না তোরা একটা ভালো মেয়ে। তারপর কমলের সলজ্জ অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, ব্যাপার কি বল তো? হঠাৎ যে তোর দাদার ওপর এতো দরদ?

পাশে বসে রীণা দুধ খাওয়াচ্ছিল মেয়েকে, চোখমুখ মুছিয়ে তাকে নামিয়ে দিয়ে বললো, আমি জানি মা, মেজদার তাড়া কিসের।

ইঙ্গিতটা না বুঝলেন তা নয়, তবু ভালো করে জানার জন্যে স্নেহলতা বললেন, কী বল তো।

মেয়ের মুখে আর একটু পাউডার বুলিয়ে দিয়ে রীণা বললো, ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে দাদা।

কমল কী বলতে যাচ্ছিল প্রতিবাদে, রীণা বললো, থামো থামো, খুব হয়েছে। তুমি বরং যাও, আমিই বলছি মাকে।

সত্যি সত্যিই উঠে গেল কমল। রীণা বললো, রেখাকে তো দেখেছ তুমি। সে-ই। তাকে খুব পছন্দ, বুঝছো না?

কী বলেছিলেন স্নেহলতা এখন আর মনে নেই ঠিক। তবে তার মাস ছ'য়েকের মধ্যেই নরেনের বিয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু দুই ছোট্ট ঘরে

খাট আলমারি, ড্রেসিং টেবিল কোথায় থাকবে ? সুতরাং ছোট ঘরে ওঁরা চলে গেলেন বেলাকে নিয়ে। সরোজকে যেতে হল বারান্দার ঘরে কমলের কাছে।

ঘর ভেলোর প্রশ্ন উঠতে প্রথমে অমরনাথ বলেছিলেন আরো বছর ঘুরেক যাক্ না, সরোজের একটা চাকরি বাকরি হোক্।

বীণা বলেছিল ওরা চলে যাবে। কিন্তু যাব-যাব করেও যেতে পারেনি বীণা। মাত্র পাঁচশো টাকা মাইনে অপরেশের, ঘর ভাড়ায় যদি দু' শো টাকা বেরিয়ে যায় তো খাবে কি আর পাঠাবেই বা কি বুড়ো বাবা-মাকে ? শেষে ছোট ঘরটাই জায়গা দিতে হল কমল আর রেখাকে। বারান্দায় আর একটা পার্টিশন দিয়ে বেলার থাকার ব্যবস্থা হল।

কমলের বিয়ের কথা শুনে প্রথমে অমরনাথ আশ্চর্য হয়ে বলেছিলেন, এখুনি ? এই তো এক বছর হয়নি নরেনের বিয়ে হল, বেলার বিয়ে হোক্ আগে। তা ছাড়া কতই বা বয়স হল ওর ?

স্নেহলতা হেসে বলেছিলেন, ওর বয়সে তোমার নরেন, কমল, বীণা, তিন ছেলে মেয়ে হয়েছিল মনে নেই ? সে জন্যে নয়, আজকাল একটু দেরিতেই বিয়ে হয়। কিন্তু সাহস হয় না আমার চারদিক দেখে শুনে।

রেখার কথাটা বলতে হয়েছিল সেদিন খুলে। মা-বাপ-মরা মেয়ে, মামার কাছে মানুষ। অপছন্দ নয় রেখাকে, কিন্তু প্রশ্ন তো শুধু ঘরেরই নয়। কমল আর নরেনের আয়ে কি আর একজন বৌ-এর ভার নেওয়া চলে ?

মা আর বাবা। চিন্তা করতেও লজ্জা এ ধরণের সমস্যাগুলি। স্বামী আর স্ত্রী পরম আপন। তবু মনে মনেই রইলো কথাগুলি।

কিন্তু বীণার কথাগুলিও তো অগ্রাহ্য করার নয়। বীণার অর্থাৎ কমলের। রেখার মামা বিয়ের জোগাড় করছে পঁয়তাল্লিশ বছরের বিপত্নীক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা না করলে রেখা বলেছে বিষ খাবে। আর কমলের মতিগতি তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। বীণাকে বলেছে বাবা-মা রাজী না হলে অগত্যা রেজেস্ট্রী করে সমস্যার সমাধান করবে সে শেষ পর্যন্ত। না হয় বারান্দাতেই—আর তাও আপত্তি থাকলে কোথাও একটা ঘর নেবে।

কিছুদিন পরে স্নেহলতাই প্রস্তাব তুলেছিলেন, একটা উপায় আছে।

—কী ?

—তুমি আর আমি যদি গ্রামে গিয়ে থাকি।

—গ্রামে ? কী বলছ তুমি ? পারবে তুমি এই বয়সে ? বীণা পালিয়ে

এলো ম্যালেরিয়ার ভয়ে—

স্নেহলতা বলেছিলেন, এ ছাড়া আর উপায় কি বলো? শেষ পর্যন্ত যদি সত্যিই রেজেষ্ট্রি করে বসে, কী গোলমাল বলো তো, ঘরে তো নিতেই হবে বৌ-কে তখন? তার চেয়ে মেনে নেওয়াই ভালো।

তারপর হঠাৎ জোর করে আনা উৎসাহ দেখিয়ে বলেছিলেন, ভালই তো। জমি রয়েছে, যা হোক একটা বাড়ি রয়েছে ওখানে। ভাড়া তো আর দিতে হবে না, বরং দেখে শুনে নিলে আমাদের দু'জনের জমির ধানেই চলে যাবে মোটামুটি, তুমিও তো বলেছ। জমির ধান-শাক-তরকারী, পুকুরের মাছ আমার তো বরং ভালোই লাগবে। ছেলে মেয়েরাও যাবে মাঝে মাঝে, টাটকা জিনিসপত্র পাবে। এখানে তো সবই কিনতে হয়। অথচ গ্রাম থেকে বছরে তিন চারশো টাকা পাও কি পাও না।

তারপর, বেশ তো, স্নেহলতা বুঝিয়ে বলেছিলেন স্বামীকে, ভালো না লাগে চলে আসবো আবার দু-তিন বছর পরে। সরোজও চাকরি করবে তখন। আর ইনসিওরেন্সের টাকাটাও তো পাওয়া যাবে ততদিনে। না হয় আর একখানা ঘর তুলে নেওয়া যাবে।

প্রথম প্রথম মন্দ লাগেনি গ্রামজীবনের আস্বাদ। ছেলেমেয়েরা আসতো ঘন ঘন, বৌমারাও এসে থেকে গেল দু-একবার। অফুরন্ত অবসর, খোলা বাতাস, সব্জীবাগান, আমকাঁঠালের মিষ্টি গন্ধ, লেবু, কুল, করমচা, সবই তাঁর নিজস্ব।

তারপর ম্যালেরিয়া ধরলো আস্তে আস্তে। ছেলে মেয়েদের উৎসাহেও ভাটা পড়লো। খরচের প্রশ্নও আছে। যাতায়াত কমে এলো ধীরে ধীরে। বছর দুয়েকের মধ্যেই স্নেহলতার ছোট্ট সংসার পৃথক হয়ে গেল। প্রথম ক'মাস টাকা পাঠিয়েছিল দু'ছেলে। কমতে কমতে সেটাও বন্ধ হয়ে গেল এক সময়। কলকাতায় খরচ বাড়ছে আস্তে আস্তে।

ইনসিওরেন্সের টাকাটা পাওয়া গেল গত বছর। ঘরও উঠলো। একখানা নয়, দু'খানা কিন্তু সে দু'খানা ভাড়া দিতে হল, স্নেহলতার শেষ আশাটুকু নিভিয়ে দিয়ে। খরচ বাড়ছে ছেলেদের। ওরা আর চালাতে পারছিল না। শেষ সম্বল কুড়িয়ে বাড়িয়ে বেলার বিয়ের যোগাড় করলেন। এই ক'টা টাকা সংসারের টানে ফুরিয়ে গেলে কী হত তারপর?

সানাইয়ের সুরে ঘুম ভাঙলো স্নেহলতার। ধড়মড় করে উঠে বসলেন চোখ

রগড়ে। ছাদের কার্ণিশে রোদ এসে পড়েছে। ছি ছি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন এত বেলা পর্যন্ত। কী হচ্ছে কে জানে নীচে। কুশণ্ডিকার জোগাড় করতে হবে, এতগুলি লোকের চা-জলখাবারের ব্যবস্থা চাই।

ত্রস্ত পায়ে নেমে এলেন স্নেহলতা। আরো একটু ঘুমুন অমরনাথ, ক-মিনিটই বা। এখুনি রোদ এসে পড়বে।

নেমে আসতে আসতে ভয় হল, হঠাৎ ছাদে শুয়ে জ্বর না এসে পড়ে। আহা, সত্যিই যদি জ্বর এসে যেতো।

মনে মনে লজ্জা পেলেন স্নেহলতা। এ কি স্বার্থপর চিন্তা তাঁর! এই ভিড়ে বিয়েবাড়িতে জ্বর হলে তাঁকে নিয়ে বিব্রত থাকলে চলবে কী করে? একটু শোওয়ার জায়গা পর্যন্ত নেই। জ্বর যদি আসেই তো আরো যেন দুটো দিন দেরী করে আসে। এখানে নয়, গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর।

নীচে তখনো মায়াস্নিগ্ধ স্নেহনীড়ে সুষুপ্তির আশ্বাস। কাউকে ডাকলেন না স্নেহলতা। অবসন্ন হাতে জোর টেনে কাজে লাগলেন আবার, গত রাত্রির গ্লানিময় চিন্তাগুলিকে চাপা দিয়ে।

দিনের শেষে

প্লটের জন্যে তুমি পাগল হয়ে উঠেছ, সুবিনয়? কী আশ্চর্য, গল্পের জন্য মাথা খুঁড়ছ? সিনেমার নায়ক নায়িকা থেকে শুরু করে অভিজাতদের আড্ডায় ঘনিষ্ঠ হতে চেষ্টা করছ গল্পের খোঁজে। অথচ এত গল্প তোমার জানা আছে, এত গল্পের নায়ক তুমি নিজে। পবিত্রর কাছ থেকে একথা শুনে অবাক হয়েছি। ভেবেছি আমি তোমাকে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারি কি না।

নাঃ অবাক হবার কী আছে। গল্প তো খুঁজতেই হবে তোমাকে। এমন রোমাঞ্চকর নাটকীয় গল্প তোমার চাই যে গল্প তোমার পৃষ্ঠপোষকরা লুফে নেবে। ওই ধরনের গল্প নইলে তো তোমার চলবে না।

এর আগে তো অনেক গল্প লিখেছ নীচুতলার মানুষের কাহিনী নিয়ে। এবং সেই গল্পে তোমার অর্থও হয়েছে, সুখ্যাতিও হয়েছে। আসলে, এই সব গল্প লিখেই তো নাম করেছ তুমি। বোবা ভিখিরি, শ্মশানের কেরানি, মুর্দোফরাস, ভালুকওয়ালা, জেলে, মুচি, মজুর, ছোটলোক—এদের গল্পই তো বিখ্যাত করেছে তোমাকে। এ ছাড়া তোমার বর্তমান জীবনের অভিজ্ঞতাও তো ফুরিয়ে যায়নি, সুবিনয়। তা থেকেও তো সুন্দর রঙীন গল্প লেখা যায়। নাকি অভিজ্ঞতা থেকে লিখতে ভয় পাচ্ছ? সে গল্পে হয়তো বড় অথবা ঘনিষ্ঠ কাউকে জড়িয়ে ফেলবে, যে তোমার উপর অসন্তুষ্ট হলে ক্ষতি হতে পারে?

তোমার প্রথম যুগের দৃষ্টি কি হারিয়ে ফেলেছ, সুবিনয়? কিন্তু অন্তরের আবেগ, বুদ্ধি-বিবেচনা কি হারানো যায়? পনের বছরে এত পরিবর্তন কি হতে পারে? আমি বিশ্বাস করি না। হৃদয়, দৃষ্টি, আবেগ, বিচার-বুদ্ধি তোমার এখনো আছে। এগুলি তুমি চেপে রাখতে চাইছ, সে দৃষ্টি জোর করে সরিয়ে নিচ্ছ ব্যবহারিক প্রয়োজনে, অর্থের প্রলোভনে। অর্থের প্রয়োজন আছে বই কি, অর্থ নইলে ভালভাবে, ভদ্রভাবে বাঁচবে কী করে?

বক্তৃতা দিচ্ছি, মনে হচ্ছে, না? সত্যিই তো অবান্তর কথা এসব। উপদেশ দেবার বা সমালোচনা করার জন্যে ত চিঠি লিখতে বসিনি। উপদেশ

লাচনা তুমি শুনবেই বা কেন? প্লটের ব্যাপারেই তোমাকে সাহায্য
চ চাই।

া, চাষী, মজুর, কেরানিকেই নায়ক ক'রে অথবা দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ, আন্দোলন
তোমাকে লিখতে বলছি না। এ সব সত্যিই ভালো লাগে না। (যদিও
আগে এর মধ্যেই সাহিত্যের উপাদান খুঁজে বের করতে। আবেগ দিয়ে
দিয়ে রসোত্তীর্ণ করতে। সে কথা থাক্. আমি জানি তোমার
য় আজকের যারা ভক্ত তাদের কাছে এসব বিরক্তি জাগাবে। তা ছাড়া
দিয়ে সিনেমাযোগ্য গল্প হয় না তা কি আমি জানি না।) চিরন্তন অথচ
াকর্ষক চমকপ্রদ কিছু চাই, যা সাধারণের জীবন থেকে একটু স্বতন্ত্র, একটু
বগ-বেদনাময় অথচ অসাধারণ। একটু নাটকীয়! এই তো?

ী রকমের প্লট খুঁজছ তুমি? হৃদয়ের, প্রেমের, বেশ মন-ভোলানো,
ানো, ঝলসানো কাহিনী অথবা নিবিড় কোন বেদনার্দ্র পরিণতি? দুটোই
রাখা যায় তবে খুবই ভাল হয়, না? বাঙালী পাঠক দর্শকের মন আবার
াপুরি মিলনান্তে খুশি হয় না। বড় হাল্কা লাগে, না?

তুমি হয়তো খুঁজে পাচ্ছ না। কিন্তু আমি জানি তোমার নিজের
নেই এই ধরনের অনেক কাহিনী আছে।

মনে করো না, গড়চা লেনের সেই কিশোরী মেয়েটির কথা। নাম একটা
হাক। সাহিত্যের উপযোগী করে বসিয়ে নিও। কেউ বুঝতে পারবে
ওই ঠিকানায় ওরা কেউ থাকে না এখন। তা ছাড়া তোমার পাঠক-
ক কেই বা জানে যে গড়চা লেনে একদিন ওই বাড়িটায় ভাড়াটে ছিলে
তাও যদি ভয় লাগে, না হয় ঠিকানাটাও পালটে দিও। ভবানীপুরের
ী শংকরী লেন হলেই বা ক্ষতি কি?

তোমার কি মনে পড়ছে না? যোধপুর পার্কের বাসিন্দা তোমরা, আজ
চা লেনের কথা ভুলে যাওয়ারই তো কথা। সেইজন্য রাণী শংকরী লেনের
বললাম, যেখানে তুমি এই সেদিনও প্রতিমার খোঁজে গিয়েছিলে। সে
ক, বিলুকে তো আর ভোল নি। মনে আছে তখন তুমি বলতে বিলুকে
দেখতে পেলে তুমি পাগল হয়ে যাবে? অপর্ণার শত অনুরোধ সত্ত্বেও
সাটা ছাড়তে চাও নি তুমি? লেখার সময় তুমি যে তখন বিবাহিত ছিলে
টা চেপে যাবে নাকি? না। ত্রিভুজ, অসম প্রেম, অথবা অমনি একটা
ছু না হলে জমবে কি করে?

বিলু কি করে তোমার কাছে জীবন-মরণ সমস্যা হয়ে গিয়েছিল সে ব
তোমার মুখেই শোনা। তুমি যা লিখেছিলে তাই মনে করিয়ে দিই :

'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না, সুবিমল, তবু তোমাকে বলছি, বিলুকে দেখতে পেলে আমি পাগল হয়ে যাই। তিনদিন এখানে ছিল না। আ যেন অন্য কেউ হয়ে গিয়েছিলাম। একটা লাইন লিখতে পারি নি। সারার দুঃস্বপ্ন দেখেছি, ছটফট করেছি, অপর্ণার সঙ্গে ঝগড়া করেছি অকারণে।

'বিলু আমাকে প্রেরণা দেয়। সত্যি বলছি, বিশ্বাস করো আজ প আমি অন্যায় কিছু করি নি। তুমি বলবে বিলুর সঙ্গে মেলামেশাটাই অন্যা কিন্তু কী করবো, ওকে ভালো লাগে, এত ভালো লাগে। না ভয় পেয়ো ন সেটুকু আস্থা আমার উপর রাখতে পারো। ওর কোন ক্ষতি আমি কর না। ওকে আমি অন্য চোখে দেখি। আমি অবিবেচক নই, দায়িত্বজ্ঞান ছেলেমানুষও নই, বয়স আমার পঁয়ত্রিশ পেরিয়ে গেছে। আর অপর্ণাকে (আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছি। অপর্ণাকে আমি ঠকাবো না।'

এই চিঠির মধ্যেই স্ববিরোধিতা ছিল। তোমার মনের দ্বন্দ্ব ফুটে উঠে আমার চোখে। তোমার এই অন্য চোখ পুরুষের চোখ হয়ে উঠেছিল এ শষ পর্যন্ত অপর্ণাকে এবং নিজেকে ঠকিয়েছিলে। সে তো আমার কা স্বীকার করেছ। অবশ্য এর জন্যে অপর্ণাকেই দায়ী করেছিলে। বলেছি অপর্ণা খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমাকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল, (এবং বিলুকেও অসহায় বিলু তোমার কাছে সহানুভূতি ও আশ্রয় চেয়েছিল। হঠাৎ তু একদিন স্নেহের পরশ দিতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলে, বিলু নারী। (আশ্চর্য, হঠাৎ এই আবিষ্কার!) অশিক্ষিতা কিশোরী বিলু মনকে গে টিপতে শেখে নি। সুতরাং ওর আবিষ্কারটা তোমার চেয়েও আগে ঘটে নিশ্চয়ই। এবং হৃদয়বান তুমি এই কিশোরীটির প্রথম প্রেমের অমর্যাদা কর পারনি!

বিলুকেই যদি নায়িকা করো ক্ষতি কী?

এর আগে গ্রামের সেই অরক্ষণীয়া লতা, প্রোষিতভর্তৃকা বৌটি, অ বালবিধবা মায়া এদের কথা বাদই দিলাম। (কারণ এরা নিজেরাই আ ছিল এবং দায়িত্ব নিতে জানতো)। কলেজ জীবনের সুরুচি, ঝর্ণা (ত ঝর্ণাকে হঠাৎ চুমু খাওয়ায় সে কেমন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল—য সাহিত্যের ভাষায় তোমরা বল বেপথুমতী, না? সেই বর্ণনাটা তোমার

শ্য যেন ঢুকিয়ে দিও)—মিতা, ছন্দা এদের কথা শুধু ছুঁয়ে গেলেই চলবে।
ছন্দা বাদে অন্তদের তো বিয়ে হয়ে গেছে। এরা ঘর-সংসার করছে!
দর নিয়ে নাটকীয় গল্প কী আর হবে? আর ছন্দার কথাও এখন থাক, ও
মোর বিশেষ পৃষ্ঠপোষকের সুনজরে আছে এখন। ওকে বাদ দিতেই হয়
বিলুই যদি তোমার নায়িকা হয় ক্ষতি কী? নাম, ঠিকানা একটু পাল্টে
লই চলবে। (আচ্ছা, অপর্ণা কি জানে বিলু এখনও তোমার প্রেরণা?)
না, শুধু এইটুকু নিয়ে কি আর ভালো গল্প হয়? স্বামী পিতা গৃহী প্রেমিক
আগের যুগেও ছিল। (বাগানবাড়ি বা অন্তত্র রক্ষিতা থাকতো আগের
া, এবং তাদের অনেকে সত্যি সত্যিই ভালবাসতো)। এর মধ্যে আর
ত্ব অসাধারণত্ব কোথায়? রূপটা (তোমরা একে আজকাল ফর্ম বলো,
?) শুধু পাল্টেছে। অপর্ণা পুরোপুরি না জানলেও কিছুটা আঁচ করে বৈকি।
র্ণা আর বিলুর ঈর্ষা, বা তোমার প্রেম দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব এ নিয়ে
তো তোমার মত লোক জবর একটা উপন্যাস লিখতে পারে। কিন্তু সেটা
পানসে গতানুগতিক হয়ে যাবে। সে আমি তোমায় বলছি না।
চমৎকার একটা প্লট অবশ্য বিলুকে নিয়েই হতে পারে। যদি পটভূমিকাটা
রা পনের বছর এগিয়ে নিয়ে যাও।
ধরো, এমনিও তো হতে পারে।

মনে করো দিব্যেন্দু (তোমার নায়কের নাম) এখন প্রৌঢ়ত্ব পার হয়ে
াক্যের দ্বারে এসে পৌচেছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত না হলেও অ্যাক্সিডেন্টের
পঙ্গু। না, ঈপ্সিতা (কেমন লাগছে নায়িকার নামটা?) চলে যেতে
র না। ওকে ত্যাগ করেনি, তাড়িয়ে দেয়নি। একদিন দিব্যেন্দুর আশ্রয়ে
, এখন দিব্যেন্দুই ওর আশ্রিত। কারণ দিব্যেন্দুর ছেলে পল্টু ব্যাপারটা
তে পারার পর যখন ঈপ্সিতাকে খুন করতে গিয়েছিল তখন বাধ্য হয়ে
লকে এবং ছেলের মা বন্দনাকে শাসন করতে হয়েছিল দিব্যেন্দুকে এবং
পর স্বভাবতই বন্দনা পল্টু ও তিলতুকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলো।
পর সে নিজেও ও পাড়ায় আর থাকতে পারেনি।
অপমানিত নিঃসঙ্গ দিব্যেন্দুকে চলে আসতে হয়েছিলো চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটে।
পেয়ে ঈপ্সিতাই গিয়ে নিয়ে এসেছিলো। হ্যাঁ, ক্রোধে, পাড়ার লোকের
ারী অপমানে রক্তচাপ বেড়ে যাওয়ায় দিব্যেন্দু অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে

পড়েছিল। ঈপ্সিতাই ওকে বাঁচিয়েছিল সেবা দিয়ে শুশ্রূষা দিয়ে সহানুভূ
দিয়ে। কিন্তু সে দশ বছর আগের কথা, তখন দিব্যেন্দুর যশ অর্থ স্বাস্থ্য
ছিল।

দিব্যেন্দুর বয়স কত হলো এখন? পঁয়ষট্টি না সত্তর? আর—ঈপ্সিত
না চল্লিশের এখনো চার-পাঁচ বছর দেরী আছে।

এই সময়কার একটা সন্ধ্যা দিয়ে শুরু করা যেতে পারে।

—ঘরে কে কথা বলছে, ঈপ্সিতা? দিব্যেন্দু ঈর্ষাটা লুকোতে পারল ন

—কেন, পরিমলের গলা কি তুমি চেন না?

—ওহ্ হ্যাঁ,। পরিমল। পরিমল তো আসবেই। একটা দীর্ঘনি
পড়ল দিব্যেন্দুর।

তীক্ষ্ণভাবে ঘুরে দাঁড়ালো ঈপ্সিতা। —তার মানে? কী বলতে চা
তুমি?

—না, কী আর বলবো।

—বললে, আবার বলছ, না। ওতো আসবেই—এ কথার মানে কি?

—না, কিছু না, ঈপ্সিতা। ভাবছিলাম, ও ছেলেটা এত আসে কেন?

ঈপ্সিতার ঠোঁটটা বেঁকে গেল।—এত আসে কেন? ওহ্! আসে ভ
লাগে বলে।

একটু থেমে তিক্ত হাসির ঝিলিক দিয়ে বললে, যেমন তোমার লাগতে
কুড়ি বাইশ বছর আগে—

—আঃ ঈপ্সিতা: সে কথা বলি নি আমি।

—বল নি তো? না বললেই ভাল।

ঈপ্সিতা ঘর থেকে যাবার আগে যেন এক দোয়াত কালি ছিটিয়ে দি
গেল।

সেই কালিটা দু'হাতে মুছতে মুছতে দিব্যেন্দুর যেন দম বন্ধ হয়ে এ
মনে পড়লো বন্দনাও কালি ছিটিয়ে দিতো, কিন্তু সে কালি আবার নি
মুছিয়ে দিতো কাঁদতে কাঁদতে—কেন তুমি বোঝ না? সর্বনাশ করছ
মেয়েটার, আমার, তোমার নিজের!

বন্দনা কেমন আছে এখন? ভালোই আছে বোধহয়? না থাকবে কে
পল্টু তো ভালো চাকরি করছে, মাকে যত্নই করে, নাতি-নাতনী নিয়ে

আছে বন্দনা। একবার দেখতে ইচ্ছা করে। ঈর্ষা হয়। রাগ হয়।

দিব্যেন্দু অস্থির হয়ে উঠলো। ভাবে…

আচ্ছা, আমার কথা কি মনে পড়ে না বন্দনার? পড়লে, কী ভাবে? শুধু ঘৃণা! আর কিছু নেই? হে, ঈশ্বর! (এই ঈশ্বরকে বৃদ্ধ অপদার্থ অথর্ব বলে ঘোষণা করেছিল বিদ্রোহী লেখক দিব্যেন্দু) ওদের আমি ভালবেসেছিলাম। আমার কর্তব্য তো করতেই চেয়েছিলাম আমি। ওদের কলঙ্ক থেকে বাঁচাতে চেয়েছিলাম আমি—ওদের কাছ থেকে সরে আসতে আমি চাই নি ঈপ্সিতার দাবী সত্ত্বেও। বাইরে ঈপ্সিতা ছিলো, থাকতো। বন্দনা মানলো না। পণ্টু বড় হয়ে উঠতেই সব বললো ওকে। পণ্টুই বাড়াবাড়ি ক'রে নিজেরা চলে গেল, ওকেও বাধ্য করলো বাড়ি ছাড়তে। তবুও তো আমি অবিবেচক ছিলাম না। ব্যাঙ্কের টাকার অর্ধেকটা পাঠিয়েছিলাম। পণ্টু বন্দনা কেউই নেয়নি। এমন কি তিলতুর বিয়ের সময়েও না। আচ্ছা তিলতুর বিয়ে দিলো কী করে বন্দনা? পণ্টু ছেলে, ওর কথা আলাদা। কিন্তু মেয়ের বিয়ে? কী বলেছিল? ওর বাবা মারা গেছে? অর্থাৎ আমি—আমি নেই! শিউরে উঠল একদিনের বিদ্রোহী লেখক, নায়ক দিব্যেন্দু। পণ্টু-তিলতুকে বন্দনা বড় করলো কি করে ওর ওই সামান্য মাষ্টারীর চাকরীতে।

নেই, সত্যিই নেই আমি। লেখক দিব্যেন্দু বেঁচে নেই। বন্দনার স্বামী পণ্টু-তিলতুর বাবাও নেই। যে আছে সে শুধু ঈপ্সিতার—না ঈপ্সিতারও নয়! দিব্যেন্দু রায় কি ঈপ্সিতার কেউ?

কেউ না। একদিনের প্রেমিক, আজকের আশ্রয়প্রার্থী। ঈপ্সিতা যদি আজ আমার ভার নিতে অস্বীকার করে, তবে এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ একা, নিঃসঙ্গ। লেখা বন্ধ হয়ে গেছে, ব্যাংকের পুঁজি নিঃশেষ। সিনেমার গল্পের টাকা কবে উড়ে গেছে। এখন আর কেউ নেয় না আমার লেখা। শান্তনু ব্যানার্জীর দিন এখন। লোকে ভুলে গেছে দিব্যেন্দু রায়কে। হে ঈশ্বর! তোমাকে বিদ্রূপ করেছি বলে কি আজ প্রতিশোধ নিচ্ছ? তবে তুমি কেমন ঈশ্বর? মানুষের চেয়েও প্রতিহিংসাপরায়ণ? না কি এই তোমার করুণা, ঈপ্সিতার এই অনুকম্পায় তার প্রকাশ? পরিমল। পরিমল। পঁচিশ বছরের একটা অপদার্থ ধনীর দুলাল। অথচ পরিমল যদি না থাকতো, ঈপ্সিতা যদি পরিমলকে না বাঁধতো?

…শান্তনু আর পরিমলকে যদি খুন করতে পারতাম—

দিব্যেন্দুর মাথা ঘুরে গেলো।

সে ভুলে গেলো, তার পা দুটো পঙ্গু হয়ে গেছে, মদ খেয়ে গাড়ি চালাতে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট করার পর।

ড্রাইভার তো ছিল, তবু কেন নিজে গিয়েছিল গাড়ী চালাতে? কারণ ছিল বৈকি, সুবিনয়। মঞ্জরীকে একা নিয়ে যেতে হয়েছিল গঙ্গার ধারে। কাগজে যে দুর্ঘটনার বিবরণটা উঠেছিল, অচৈতন্ত হয়ে হাসপাতালে না থাকলে তাতে হয়তো দিব্যেন্দু ও মঞ্জরীর নাম উঠতো না। লোকে শুধু জানতো এক লেখক এবং এক নবাগত অভিনেত্রী দুর্ঘটনায় সামান্ত আহত হয়েছেন। কিন্তু তা হয় নি। সবাই জেনেছিল—ঈপ্সিতা ও বন্দনাও। তা সত্ত্বেও ঈপ্সিতা কেন ওকে আশ্রয়চ্যুত করে নি তার কৈফিয়ত একটা তুমি নিশ্চয়ই জুড়ে দিতে পারবে, সুবিনয়।

উত্তেজিতভাবে উঠতে গিয়ে জলের গ্লাসটা ভেঙে ফেললো দিব্যেন্দু।

ঈপ্সিতা ও-ঘর থেকে ছুটে এল, কী হল? কী করে ভাঙলো? আরে, আমাকে ডাকলেই তো পারতে।

ঈপ্সিতার স্বরে বিরক্তির জ্বালা।

পরিমলও এলো। পড়ে যাননি তো? লাগেনি তো?

পরিমলের হাতের গ্লাসটার দিকে একবার আড়চোখ তাকিয়ে দিব্যেন্দু বললো, নাঃ এমন কিছু নয়। হঠাৎ তেষ্টা পেয়েছিল···

ভাঙা কাঁচের টুকরোগুলো তুলতে তুলতে ঈপ্সিতা বললো, গ্লাসটায় যে জল ছিল না, দেখতে পাও নি? নাকি আলমারি থেকে বের করতে গিয়েছিলে আবার?

দেঁতো মাতালের মত বোকা বোকা হেসে দিব্যেন্দু বললে, এই মনে পড়িয়ে দিলে তো। তা, একটু হলে মন্দ হতো না।

অমায়িক ভদ্র পরিমল ঈপ্সিতাকে বললো, আমার ওটা থেকেই একটু দিন না।

কী ভাল লাগছে না, সুবিনয়, গল্পটা? আমি বলছি একটু গুছিয়ে লিখতে পারলে (সে ক্ষমতা তোমার আছে, দিব্যেন্দুকে প্রথম জীবনে বেপরোয়া করে তোমার অজস্র ব্যক্তিগত কিছু কিছু বর্ণনা জুড়ে দিতে পারলে এ গল্প লুফে নেবে প্রডিউসাররা।

ক্ষুব্ধ হচ্ছ? মনে করছ তোমার পরিণতি সম্বন্ধে কটাক্ষ করছি? না, আমি জানি বিলু সত্যিই ভালবাসে তোমাকে এবং এও জানি বিলুর ওপরে তোমাকে কোনদিনই নির্ভর করতে হবে না। তা ছাড়া বাড়ি ছাড়লেও বিলুকে তো তুমি কাছে এনে রাখোনি যোধপুর পার্কে। বিলু তো এখনো মামার কাছে থাকে। পর পর বিয়ের সম্বন্ধগুলো ভেঙে দেওয়ার পরেও নরেশবাবু ওকে তাড়িয়ে দেননি।

সে কথা থাক। সত্যি বলো তো, গল্পটা দারুণ হবে না?

না, এখানেই কি শেষ হয়? তা হলে তো অসমাপ্ত থেকে যাবে। উপসংহার একটা চাই বৈকি।

দোহাই তোমার, গল্প যেন মিলনান্ত করে ফেলো না। ইপ্সিতা যেন পরিমলকে নিয়ে ঘর না বাঁধে, বা দিব্যেন্দু শেষ পর্যন্ত বন্দনার কাছে ফিরে না যায়।

তা হলে কি নায়ক আত্মহত্যা করবে? না, বড্ড মেলোড্রামাটিক হয়ে যাবে। আধুনিক নায়করা স্রোতের টানে ভাসে, আত্মবিশ্লেষণ করে, অথবা স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়ে বিদ্রোহী হয়, কিন্তু আত্মহত্যা করে না।

স্বাভাবিক মৃত্যুও তো অস্বাভাবিক নায়কের পক্ষে।

কিন্তু ইপ্সিতাও যদি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে? ধরো, কোন একটা মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লবের ফলে যদি সে বিষ খাওয়ায় দিব্যেন্দুকে?

শেষ দৃশ্যে দিব্যেন্দু নিশ্চল নীল দেহটার দিকে তাকিয়ে তোমার নায়িকা ভাবতে পারে: এই অথর্ব ফুরিয়ে যাওয়া লোকটা তার সারা জীবনটা ব্যর্থ করে দিয়েছে।

নাঃ, সেও তো মেলোড্রামাটিক হবে। দিব্যেন্দু বেঁচে থাক আত্মগ্লানির, যন্ত্রণার মধ্যে। পরিমল চলে যায় যাক, আর একজন কেউ আসুক ইপ্সিতা অকৃতজ্ঞ নয়, দিব্যেন্দুকে ভাসিয়ে দিতে পারবে না।

উপসংহার কোথায় করবে তুমি নিজেই ভেবে নিও। তুমি তো লেখক।

মহাল

সন্ধ্যার আগেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। আরো জোরে পা চালালো অরুণ। ভেবেছিলো ছ'টার মধ্যেই গ্রামে পৌছে যাবে। কিন্তু ট্রেনটা লেট ছিল। এখন সবে লক্ষ্মীপুরের ডাঙ্গা। ডাঙ্গা পেরিয়ে দুটো রাস্তা। একটা গেছে লক্ষ্মীপুর, আর একটা লক্ষ্মীপুরকে ডাইনে রেখে তে-সতীনের পাড় ঘেঁষে শ্রীবাটি পর্যন্ত। শ্রীবাটির ওপাশেই নন্দীগ্রাম।

নাঃ, বৃষ্টিটা ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসছে শ্রীবাটির মাঠ ভেঙে। অরুণ ডাইনের রাস্তা ধরলো।

লক্ষ্মীপুর গ্রামটা ছোট হলেও বর্ধিষ্ণু। লোকে বলে জাগ্রত কালীর আশীর্বাদ আছে গ্রামের ওপর। শোনা যায় বহু বছর আগে কালীপূজার রাত্রে মানুষ বলি হ'তো এখানে কালীর বেদীতে। প্রণাম করতে করতে অরুণের মনে পড়লো আট বছর আগেকার কথা। ছায়াকে নিয়ে মা একবার এসেছিলেন ধুনো পোড়াতে। ধুনো পোড়ানো একটা বিশেষ অনুষ্ঠান। পাঁঠা বলির ঠিক আগে, ধুনোর সরা মাথায় নিয়ে সারি দিয়ে বসবে বন্ধ্যা বউ আর রুগ্ন ছেলেদের মায়েরা। মন্ত্র পড়বেন বৃদ্ধ তারিণী ভট্টচাজ, একসঙ্গে ধুনো পড়বে সবগুলি সরায়। দপ্ করে জ্বলে উঠবে সুগন্ধ আগুনের শিখা। দশটা ঢাক বাজবে একসঙ্গে। ছেলেমেয়েরা অবাক বিস্ময়ে দেখবে আগুনের উৎসব।

অন্ধকারে দেখা যায় না, তবু অরুণ হাত বুলিয়ে দেখলো নতুন মার্বেল পাথরের বেদী। পুলিন চক্রবর্তী বড় ব্যবসায় লক্ষপতি হয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছেন মায়ের স্থান। এইসঙ্গে যদি একটা মণ্ডপ করে দিতেন! না, তার উপায় ছিল না। রোদ বৃষ্টি উন্মুক্ত আকাশই পছন্দ করেন মা কালী।

সুটকেশটা ইতিমধ্যে ভিজে গেছে। ভিতরে কাপড়-চোপড়ের কী অবস্থা কে জানে? এই বৃষ্টিতে যাওয়া যাবে না। কিন্তু অজানা অচেনা কার বাড়ী গিয়ে উঠবে? তার চেয়ে শিবমন্দিরের চালাটার নীচে অপেক্ষা করাই ভালো।

সুটকেশটা নামিয়ে মাথাটা মুছে নিলো অরুণ। বেশ শীত শীত করছে

এবার। ভাঙা চালের ফুটো দিয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ছে। ছাটটা বেশ জোর।

অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে একসময় আলোর রেখা দেখে আশান্বিত হলো অরুণ।

টর্চ-লাইট ফেলে কে যেন আসছে। কাছে আসতে বোঝা গেল বৃদ্ধ নয়, তারই বয়সী একটি ছেলে। বেদীতে প্রণাম করে শিবঘরের দিকে এগিয়ে আসতেই নজরে পড়ল অরুণকে।

—ওখানে কে?

—আমি ট্রেনের যাত্রী। নন্দীগ্রামে যাবো।

ছেলেটি উঠে এলো চালার মধ্যে।—অরুণের দিকে তাকিয়ে বললো, আপনি যে একেবারে ভিজে গেছেন দেখছি।

অরুণ বললো, এখুনি তো ছেড়ে যাবে।

—কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজবেন, সে কি হয়? তাছাড়া, এই রাত্তিরে আলপথ দিয়ে যাবেনই বা কেমন ক'রে? আজকের রাত্তিরটা বরং থেকে, কাল ভোরে যাবেন।

অরুণ হেসে বললো, আজ রাত্রেই ফিরতে হবে আমাকে।

—বৃষ্টি থামলে তো। সে পরে দেখা যাবে বরং আমাদের বাড়ী চলুন।

সুটকেশটা ইতিমধ্যে তুলে নিয়েছে ছেলেটি। অরুণ আর আপত্তি করলো না।

নিজের পরিচয় দিয়ে ছেলেটি বললো, আমার নাম বিমল চ্যাটার্জী। আচ্ছা নন্দীগ্রামে কি আপনার বাড়ী?

অরুণ বললো—হ্যাঁ, আমার নাম অরুণ ব্যানার্জি।

—আরে, আপনাকে তো আমি চিনি। আপনি তো সুরেন্দ্রনাথে পড়েন, না? নাম শুনেছি। আপনার আর্টস বলে আলাপ হয়নি।

—আপনি কী ক'রে জানলেন?

—বাঃ, পাশের গাঁয়ের লোক আপনি, জানবো না? আপনি না হয় বিদেশে বিদেশে কাটিয়েছেন, দেশের খোঁজখবর রাখেন না। আমরা তো আজন্ম এদেশেই মানুষ। দেখুন দেখি আপনি কিনা এখানে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন।

বিমল বাড়ী ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলো।—মা, দেখে যাও কাকে ধরে এনেছি।

বিমলের মা সব কথা শুনতে পাননি, বললেন, আয় না এখানে। আমি তরকারী চাপিয়েছি, পুড়ে যাবে যে।

বিমল রান্নাঘরেই ঢুকে পড়লো অরুণকে নিয়ে।—এই দেখো, আমাদের কলেজের অরুণবাবু। নন্দীগ্রামে বাড়ী।

অরুণ প্রণাম করতে বিমলের মা নতুন লোকের সামনে ভীষণ লজ্জা পেয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ঘোমটা দিতে গিয়ে। হোক্ না ছেলের বয়সী অপরিচিত তো।

—থাক, থাক, চলো বাবা। ইস কাপড়-জামা যে ভিজে শপ্ শপ্ করছে। তোর কী বুদ্ধি বিমু, আগে কাপড়-জামা দিতে হয়, অসুখ করবে যে।

—উনি তো বলেন কিচ্ছু হবে না। শিবতলায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছিলেন। আমি জোর করে ধরে নিয়ে এলাম।

—বেশ করেছিস্ এনে। কাপড়-জামা ছাড়তে দে আগে। হ্যাঁ, বাবা এমন করে কেউ ভেজে? যদি অসুখ-বিসুখ হয়?

বিমল বলে, জানেন অরুণবাবু, মা আবার গাঁয়ের বন্ধুদের সামনেও ঘোমটা দেয়।

হাসলেন বিমলের মা। কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। তারপর থেকে এই বাড়ীর চৌকাঠ ক'দিন পার হয়েছেন গুণে বলে দিতে পারেন এখনো। দুর্গাপূজা কালীপূজা আর বিশেষ নিমন্ত্রণ ছাড়া বাইরে যাবার হুকুম ছিল না।

বিমলের বাবা নারায়ণ চাটুজ্যের বিয়ে হয়েছিল ছাব্বিশ বছর বয়সে। গরীব ঘরের টুকটুকে বৌ এনেছিলেন বিমলের ঠাকুরমা, ছেলেকে ঘরে বাঁধবার জন্যে। নারাণ চাটুজ্যে বাঁধা পড়েননি। বাড়ীর মধ্যে বন্দী হয়েছিলেন সাবিত্রী দেবী। তিন বছর পরেই মারা যান বিমলের ঠাকুরমা। তারপর থেকে স্বামীর কীর্তি-কাহিনী বামীর মারফৎ কানে এসেছে বৈ কি তাঁর। তিনি নিজেও কম অত্যাচার সহ্য করেননি। সেসব দিনের কথা থাক। বিমুকে পেয়ে জীবনের অর্থ খুঁজে পেয়েছেন তিনি। বিমু কতো তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠলো। এই তো সেদিন বিমু এলো বুক জুড়ে। ছেলে তো নয় আকাশের চাঁদ। না, এ তাঁর নিজের ছেলে বলে গর্ব করা নয়। গাঁয়ের লোক কী ভালোই না বাসে বিমুকে। ইস্কুল, ক্লাব, সমিতির কোন ব্যাপারই বিমুকে নইলে চলে না। এমন যে দুর্দান্ত বিমুর বাবা তিনিও সমীহ করেন

ছেলেকে। শুধু স্নেহই নয়, গর্বও আছে, ভয়ও আছে।

গাঁয়ের লোক বলে, অর্থাৎ বামী বলে, দাদাবাবুকে ভয় করে কত্তাবাবু, জানো মা। দাদাবাবু বড়ো হওয়ার পর থেকে কত্তাবাবু আর সে কত্তাবাবু নেই।

সাবিত্রী দেবী জানেন বামীর কথা মিথ্যে নয়।

চা খাওয়া শেষ হলে বিমুর মা বল্লেন, যাও এবার তোমরা ওঁর সঙ্গে দেখা করে এসো।

ইতিমধ্যে অরুণের রাত্রে ফেরার প্রশ্নটা চাপা পড়ে গেছে। বৃষ্টি থামার কোন লক্ষণ নেই। তাছাড়া বিমলের সঙ্গে গল্প করতে ভালই লাগছে। আর উপায়ই বা কী?

নারায়ণবাবু তখন প্রজাখাতকদের দরবার শেষ করে হিসেব মেলাচ্ছিলেন। এ তালুকদারীটুকু তাঁর নিজের হাতেই করা। যৌবনকালে বাবার সম্পত্তি উড়িয়ে দিয়েছেন মুঠো মুঠো করে। লোকে ভেবেছিল এবার পথের ভিখিরী হবে নারাণ চাটুজ্জে। তা হয়নি। বিমু আসার পর একদিন হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, তাই তো ছেলেকে যে বাঁচাতে হবে। এই খেয়ালের পিছনে একটা ইতিহাস আছে।

পাশের গ্রামের শেষ সম্পত্তিটুকু বিক্রী করে যখন টাকাটা শহরেই শেষ করে দিয়ে একমাস পরে ফিরলেন, তখন বিমুর মা বলেছিলেন—ঘোষ কাল থেকে দুধ দেবে না বলছে, কি খাবে খোকা?

ক্ষেপে উঠেছিলেন তিনি—কী? দুধ দেবে না বলেছে বেটা? বড় বাড় বেড়েছে হারামজাদা।

রেগে বেরিয়ে গিয়ে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিলেন ঘোষের, কিন্তু দুধ মেলেনি। বিমু কেঁদেছিল সারারাত। তার পর থেকে মতি ফিরে গেল নারায়ণ চাটুজ্জের। খাস জমিগুলো দেখতে শুরু করলেন নিজে, হিসেবী হলেন বিমলের বাবা।

জোচ্চুরি করেছেন, অত্যাচার করেছেন, সর্বনাশ করেছেন কত লোকের। কিন্তু তালুকদারী হয়েছে। বিমুকে মানুষ করতে হবে—বিমুর যেন কোনোদিন কিছুর অভাব না হয়।

ক্রমশঃ চাটুজ্জেমশাইকে সম্পত্তির নেশা পেয়ে বসেছে।

ক'দিন ধরে তিনি ভীষণ উদ্বেগের মধ্যে আছেন। মধুসূদন মিত্তির জলের দরে ছেড়ে দিচ্ছে কালিক্ষেতলার মহালটা। তাগাদা দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, মিষ্টি

কথায়, টাকা উঠেছে হাজার প্যাঁচেক। বিমুর মা-এর গহনাগুলো ধরলে পাঁচ হাজার। তবু টান পড়ছে হাজার পাঁচেকের। কোথায় পাওয়া যায় এতগুলো কাঁচা টাকা?

চিন্তায় ছেদ পড়লো।

—বাবা ইনি অরুণ ব্যানার্জি। নন্দীগ্রাম যাচ্ছিলেন এই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে, আমি নিয়ে এলাম ডেকে। আজ থাকবেন এখানে।

অপ্রসন্ন দৃষ্টি মেলে নারায়ণ চাটুজ্জে তাকালেন—ওহ্। থাক থাক, প্রণাম করতে হবে না। হ্যাঁ, না গাঁয়ে বাড়া তোমার, কার ছেলে?

—নিবারণ বন্দোপাধ্যায়।

—ও রেলে কাজ করতেন যিনি? অন্যমনস্কভাবে দায়ে পড়ে যেন কথাগুলো বললেন নারায়ণ চাটুজ্জে।

—হ্যাঁ, আপনি চেনেন?

—চিনি বৈকি। আচ্ছা যাও. মুখ হাত ধোও গিয়ে।

খাতাপত্রগুলো আবার টেনে নিলেন চাটুজ্জে মশাই। টাকার সমস্যাট সমাধান করা দরকার।

খাবার জায়গা হলো একসঙ্গে। অরুণ, বিমল আর বিমুর বাবা।

চাটুজ্জে মশাই অন্যদিন খেতে বসে গল্প করেন বিমুর সঙ্গে। কলকাতার গল্প। কলেজের মাস্টার মশায়দের আর বন্ধুদের গল্প। কী খাওয়ায় হোস্টেলে, ঠাকুর রাঁধে কেমন? খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুধোন আইন আদালত কোর্টের খবর, দেশী-বিদেশী সংবাদ। চাটুজ্জে মশাই-এর এটুকু বিলাস। আজ কিন্তু অন্যমনস্ক। ওদের কোন আলোচনাতেই যোগ দিতে পারেন না।

সাবিত্রী দেবী আজ বহুকাল পরে বাইরের লোক পেয়েছেন কথা বলার জন্যে। —ক'টি ভাই তোমার অরুণ?

—তিন ভাই, চার বোন।

—তুমি বুঝি ছোট?

—না মাসীমা, আমি দু'ভাই আর তিনবোনের পরে।

—বোনেদের সব বিয়ে হয়ে গেছে?

—একজন বাকী ছিল, তারই তো দশ তারিখে বিয়ে। দেখুন না, ছায়াটার জন্যেই আমার এই দুর্গতি। দাদারা সব ব্যস্ত। আমাকেই পাঠালে

গহনাপত্র দিয়ে। সব ঠাকুমার জেদ। ছায়ার বিয়ে গাঁয়েই দিতে হবে। গহনাপত্র আগেভাগে পৌছানো চাই, বৌদিদের হুকুম। আর বাবার তাগাদা কিছু টাকা না হলে সব আটকে যাচ্ছে। বড়দার ছুটি পেতে সেই শুক্রবার। সুতরাং যত দায় আমার।

হঠাৎ হেসে ফেলে অরুণ আবার বললে,—প্রথমে ভীষণ রাগ হচ্ছিল ওর ওপর বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে। ওর গয়নাগুলো আনতে গিয়েই তো আমার দেরী হয়ে গেল। ছুটি হয়ে গেছে ছ'দিন আগে। আজ দিচ্ছি কাল দিচ্ছি করে, দিল আজ সকালে। এমন রাগ হচ্ছিল তখন। এখন ভাবছি দেরি হয়েছিল বলেই তো আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল।

বিমল বল্লে, আপনার সাহস তো কম নয়। এই সব গয়নাপত্র টাকাপয়সা নিয়ে আপনি রাত্তিরে একা একা যাচ্ছিলেন? দেখুন তো বাঁচিয়ে দিলাম আপনাকে আমি।

অরুণ বল্লে, কি করি? লোক এসে পৌছালো না। ভাবলাম কে আর জানছে আমার কাছে গয়না আছে টাকা আছে? তবে ডেকে অবশ্য ভালই করেছেন? সত্যি, এখানকার কিছুই তো চিনি না—সেই একবার এসেছিলাম এখানে আট বছর আগে কালী পূজার সময়।

—বেশ তো, বিয়ের পর চলে আসুন না, এদিকটা বেড়িয়ে যাবেন আমার সঙ্গে।

—আসতে পারি, আপনি যদি আমাদের বাড়ী যান আমার সঙ্গে। চলুন না, বিয়েটা দেখে আসবেন।

বিমল যেন লাফিয়ে উঠলো—যাবো মা?

মা বলেন, হ্যাঁ, এই বর্ষাকালে কোথায় যাবি কাদায় কাদায়? যাবি এখন একসময়।

—তোমরা কোথাও যেতে দাও না আমাকে। বিমল রাগ করলো। মা ইশারা করে দেখিয়ে দিলেন বাবাকে, আমি কি করবো, উনি যেতে দেবেন নাকি?

সবাই হঠাৎ দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখলো, খাওয়া বন্ধ করে এক হাতে মাথা চুলকোচ্ছেন বিমুর বাবা। এসব কোন কথাই বোধ হয় তাঁর কানে যাচ্ছে না। ঈস, এতক্ষণ ওরা যেন ভুলে গিয়েছিল উনি পাশেই বসে আছেন।

হঠাৎ আবহাওয়াটা বদলে গেল। মুখ নীচু করে খাওয়া শেষ করলো

সবাই।

চাটুজ্জে মশাই যেন সম্বিৎ ফিরে পেয়ে আপন মনে বললেন, টাকা পয়সা নিয়ে চলাফেরা করা ঠিক নয়। দিনকাল ভাল নয়।

হাত ধুয়ে চাটুজ্জে মশায় গড়গড়াটা নিয়ে দরদালানে গিয়ে বসলেন।

শোবার জায়গা করতে গিয়ে গোলমাল বাধলো। নিজের বুদ্ধিমত বাইরের ঘরে শুধু অরুণের জন্য বিছানা করেছিল বামী। বিমল রেগে গিয়ে বললো—কে বলেছে তোকে এমন করে বিছানা করতে? যা আমার বিছানা নিয়ে আয়।

—চেঁচামেচি কোরো না দাদাবাবু। রোজ তুমি এখানে শোও না কি?

—বাজে বকিস্ না, যা বলছি তাই কর। আমার বিছানাও এখানে কর।

—জানি না বাপু, মাকে ডাকছি আমি।

বামী গজগজ করতে করতে চলে গেল।

গোলমাল শুনে মা নিজেই এসে হাজির। —কি হয়েছে?

—বাঃ, উনি বুঝি একা এই গয়নাপত্র নিয়ে বাইরে থাকবেন?

—স্যুটকেশটা নিয়ে ভিতরে রেখে দিই, তাহলে?

যাই করো আমরা বাপু একসঙ্গে শোব বলে দিচ্ছি, বিমল বললো।

বিমলের মা বললেন,—ও তাই বলো, সারারাত গল্প করার মতলব? ও বেচারা সারাদিন খেটেখুটে আসছে, ঘুমুতে দে ওকে। তুই চ ভিতরে, এখানে ঘুম হবে না।

শেষ পর্যন্ত বিমলের জিদই বজায় রইলো। অরুণ আর বিমলের বিছানা বাইরের ঘরেই হলো। অরুণের খাটের উপর আর বিমলের তক্তাপোষে জানালার ধারে চাটুজ্জে মশাই একবার দেখে গেলেন। সাবিত্রী বললেন, বাইরের দিকের জানালা কিন্তু খুলবে না, বিমু।

নারায়ণ চাটুজ্জ্যের চোখে আজ ঘুম আসছে না টাকার যোগাড়ের চিন্তায়।

মাঝ রাত্তিরের পর ভাবতে ভাবতে মাথাটা গরম হয়ে উঠলো। মাথায় জল দিয়ে গা মুছে পায়চারী করতে করতে দালান পার হয়ে বাইরের ঘরের দিকে এলেন।

একি! দরজাটা খুলেই শুয়েছে ওরা। জানালাটাও যে খোলা। সেখান দিয়ে একটা অ্যবছা আলো আসছিল তারাফোটা আকাশের। এটা ঠিক

হয়নি, সুটকেশে টাকাকড়ি গহনাপত্র রয়েছে ছেলেটার ! জানালাটা বন্ধ করে দেবেন বলে ঘরে ঢুকে চাটুজ্জে মশাই চমকে উঠলেন ।

জেগে আছে নাকি ছেলেটা ? নাঃ, ওটা ওর পাঞ্জাবী । হাতে ভারী একটা কী ঠেকলো । সুটকেশটার চাবি নিশ্চয়ই ।

কত টাকার গহনা আছে সুটকেশটার মধ্যে ? চাবিটা নিয়ে নাড়াচাড়া করেন চাটুজ্জে মশাই ।

কিন্তু ও যদি জেগে ওঠে ? যদি দেখে মাঝ রাত্তিরে সুটকেশ খুলে গহনা দেখছেন বিমলের বাবা ?

ঘাম হচ্ছে নারায়ণ চাটুজ্জের । ঘামটা মুছে ফেললেন কাঁধের গামছাটা দিয়ে ।

নাঃ, দরকার কি ওঁর গহনা দেখার ? উনি তো আর ওই গহনা বেচে মহালের টাকা জোগাড় করতে যাচ্ছেন না ।

কিন্তু সুটকেশটা কোথায় ? ছেলেটার খাটের নীচেই তো ?

একি ! সুটকেশটা খুলে ফেলেছেন তিনি ! হাতড়ে হাতড়ে দেখেন । গহনার বাক্সগুলো কই ? এই তো একটা কাগজের বাক্স । তার মধ্যেই ! মানে বড় দোকানে কেনা নয়, স্যাকরার তৈরী ।

একটা বাক্সেই সব কাগজে জড়ানো জড়ানো । বাক্সটা রেখে দিলেন চাটুজ্জে মশাই ।

কিন্তু বেশ কিছু টাকাও তো নিয়ে যাচ্ছে, বলছিল । টাকাগুলো কোথায় রাখলো আবার ? কত টাকা আছে ওর সঙ্গে ?

হাতে একটা প্যাকেট ঠেকলো ।

··বাঃ বেশ ভারীভারী লাগছে । হাজার পাঁচেক হবে ?

নাঃ, একি করছেন তিনি ! মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে । তাড়াতাড়ি সুটকেশটা বন্ধ করে ফেললেন চাটুজ্জে মশাই ! এত জোরে শব্দ হয় কেন ?

য়্যাঁ, সর্বনাশ, উঠে পড়েছে ছেলেটা ! এখনি বিমুকে ডাকবে ।

বাঘের মত লাফিয়ে উঠলেন চাটুজ্জে মশাই । শব্দ না করতে পারে— গলাটা চেপে ধরলেন দু হাতে । তারপর একহাত দিয়ে কাঁধের গামছাটা নামিয়ে ওর মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন ।

পা দুটো ছটফট করছে ; কিন্তু পুরু গদীর ওপর কোন আওয়াজ হচ্ছে

না। বিমু জাগবে না।

একটু পরে খাট থেকে নেমে পড়লেন চাটুজ্জে মশাই। আর ছটফটানি নেই।

মারা গেল নাকি? না, বোধ হয় অজ্ঞান হয়ে গেছে ভয়ে।

জানালাটা বোকার মত খোলা রেখেছে। জানালার একটা শিক আল্‌গা আছে—একটু চাপ দিলেই সরিয়ে ফেলা যায়। আবার জানালার কাছে গিয়ে শিকটা ফাঁক করে দিলেন চাটুজ্জে মশাই।

বিমু অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

নীচু হয়ে ত্রস্ত হাতে গহনাগুলো আর প্যাকেটটা বের করে নিয়ে সন্তর্পণে উঠে দাঁড়ালেন।

সবাই জানবে চোর এসে গহনাপত্র সব চুরি করে নিয়ে গেছে। —ছেলেটা নিশ্চয়ই মরবে না। উনি তো বেশীক্ষণ গলাটা টিপে রাখেননি।

চাবিটা ওখানেই ফেলে দিয়ে পা বাড়ালেন দরজার দিকে।

হঠাৎ স্যুটকেশটায় পা লেগে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন চাটুজ্জে মশাই। গহনাগুলো আর প্যাকেটটা ছিটকে পড়লো।

—কে? কে? অরুণ ভয়ে চীৎকার করে উঠলো।

আঁঃ! খাটের ওপর কে ছিল তা হলে? বিমু!!!

বজ্রাহত চাটুজ্জে মশাইয়ের গলা থেকে একটা চাপা আর্তনাদ গোঙানির মত উঠে স্তব্ধ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

একটি অপ্রকাশিত সংবাদ

বাস থেকে নেমে শঙ্কিত চোখে মোড়ের ঘড়িটা একবার দেখে নিল: সমরেশ। দশটা বাজতে কুড়ি মিনিট।

এই পথটুকু আরো মিনিট তিনেক। দ্রুত পা চালালো সে।

দু-এক মিনিটে কী বা যায় আসে? তবু সমরেশ লাফিয়ে উঠলো সিঁড়িগুলো।

ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বিপিনবাবু বলেন, কী হে আসতে পারলে শেষ পর্যন্ত?

কাজ থাক বা না থাক চার্জের সাব-এডিটার আর একজন না আসা পর্যন্ত যেতে পারে না, বিশেষ করে রাত্রের শিফ্‌টে। সন্ধ্যার লোকেরা চলে গেছে। রাতের সবাই এখনো এসে পৌঁছায়নি, বিপিনবাবু ঘাঁটি আগলে বসে থাকতে থাকতে অস্থির হয়ে উঠেছেন।

অপ্রস্তুতের ভঙ্গিতে সমরেশ বলে, একটু দেরী হয়ে গেল বিপিনদা বাসের জন্যে। যান. আপনি যান।

একটু আগে বের হলেই হয়, বিপিনবাবু বিরসমুখে বলেন। সেই একটায় বেরিয়েছি বাড়ি থেকে ভালো লাগে না বাপু বুড়ো বয়সে। সমরেশ বোঝে। সত্যই, যাওয়ার সময় এক মিনিট দেরী হলেও মনে হয় ইস্, কতক্ষণ আটকে আছি।

সমরেশ চেয়ারে বসে আটটা থেকে চাপা দেওয়া কপিগুলো গোছাতে শুরু করে। ঘণ্টা দেড়েক আগে থেকেই বাড়ি ফেরার আবহাওয়া এসে যায়, তারপর সন্ধ্যাবেলা আড্ডা জমলে তো কথাই নেই। রাতের লোকের জন্য গুছিয়ে রাখার কথা সমরেশ ছাড়া আর কারো মনেই থাকে না।

বিপিনবাবু খান ছয়েক হাতে-লেখা কপি দিয়ে বলেন, এই নাও 'অবশ্যগুলো'। কার কোনটা লেখা আছে। দুটো কেষ্টবাবুর আছে বাংলায়, লিখিয়ে নিও ভূপেনকে দিয়ে।

ভীষণ রাগ হয় বিপিনবাবুর ওপর। কী স্বার্থপর! এগুলোও করিয়ে

রাখতে পারেননি? রাতের চাপের মধ্যে এখন ট্রানশ্লেসন করতে হবে। বলতে গিয়ে থেমে যায় সমরেশ। এতো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। পারতপক্ষে কেউ 'অবশ্য' কপি ছুঁতে চায় না। কোথায় কার পান থেকে চুণ খসবে। চাকরী না গেলেও ধমকানি খাওয়ার ভয় আছে। তার চেয়ে রাতের শিফ্‌টের জন্ত রেখে দেওয়াই ভালো। ওদের তো দিতেই হবে মরি-বাঁচি করে। কিন্তু এমনি মজা, সন্ধ্যায় থাকলেও এ কপিগুলো সমরেশের ঘাড়েই চাপে। টেবিল পরিষ্কার না থাকলে অস্বস্তি লাগে ওর।

কপিগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে একখানা সাদা খামের চিঠি পেল সে। তারই তো, কিন্তু কে লিখেছে? হাতের লেখাটা অচেনা। থাক্‌গে পরে দেখা যাবে। ব্যক্তিগত চিঠি পড়ার সময় নেই এখন। চিঠিটা পকেটে রেখে দেয়।

সুধাংশু আর মহীতোষ এসে নিউজ এডিটরের ঘরে একবার উঁকি মেরে আড্ডা জুড়ে দেয়। ভূপেনকে লোকাল কপি করতে হবে, গল্প করার ফুরসত নেই। কাজে বসে যায় সে।

প্রুফের তাড়া এসে গেছে। এখুনি নগেনবাবু তাগাদা দিতে আসবেন। দুটো কপিতে চোখ বুলিয়ে সুধাংশুকে দেয় সমরেশ, নিন্ শুরু করে দিন, ভীষণ চাপ আজ।

—চাপ তোমার কোন্ দিন না থাকে বাপু। দাঁড়াও, একটু জিরিয়ে নিই। এক টিপ নস্যি নিয়ে সুধাংশু হাঁকে, নারাণ, এই হারামজাদা, জল খাওয়া। শম্ভু, চা নিয়ে আয় চার কাপ।

চা-টা বিনা পয়সায় দেয় কোম্পানী। সুতরাং চা আনানোর ভারটা সুধাংশুই নিয়েছে।

সমরেশ প্রুফের মধ্যে ডুবে যায়। পঞ্চাশ কলম কম্পোজ করা ম্যাটার আছে। রাতের কপি আছে এর ওপর। রিপোর্টারদের কপিও তো বাদ দেওয়া যাবে না। তা ছাড়া প্রথম পাতার খবর তো প্রায় আসেইনি এখনো।

মনে মনে হিসাব করে সমরেশ। চৌষট্টি কলমের মধ্যে বাইশ কলম বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে বিয়াল্লিশ কলম মাত্র। এডিটোরিয়াল, আর্টিকল, লেটারের এক পাতা। তারপর রেডিও, কমার্স, স্পোর্টস, ওয়েদার—অন্তত কলম বারো। থাকলো মাত্র বাইশ কলম। হ্যাঁ ব্লক, 'অবশ্য,' লোকাল আর

হেডিং-এর জন্ত ছাড়ো কলম তিনেক। উনিশ, উনিশ কলম মাত্র মোট জায়গা তার। দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো সমরেশের।

নগেনবাবু ক্ষেপেই আছেন। —নিন্ জায়গা করুন এবার। কোথায় যাবে আপনার এই ছাতামাতা গন্ধমাদন ? ছাপাখানার লোক তো আর মানুষ নয়, দাও যত পারো কপি ঠেলে টিক মেরে।

সমরেশকে হাসতে হয়। প্রিন্টারকে খাতির না করলে রাতে কাগজ বের করা যায় না ঠিকমত। একটা সিগারেট এগিয়ে দেয় সে নগেনবাবুকে।

সমরেশের সিগারেটটাও ধরিয়ে দেন নগেনবাবু। কথঞ্চিৎ শান্ত বোধ হয় ওঁকে। সিগারেটের ধোঁয়ার গুণে না সমরেশের খাতিরে, কে জানে ? ধোঁয়া গেলেন না নগেনবাবু। গিলে ফেলে চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, দিনে থাকলে বাবুদের খেয়াল থাকে না ক'পাতা কাগজে কতটুকু জায়গা। আপনি দাগান বাবু, আমি আবার দেখি ছবির ব্যাপার।

নিউজ এডিটরের ঘরের দিকে ফিরতে ভূপেনের দিকে চোখ পড়ে। বলেন, ভূপেনবাবু যে আর মাথা তুলতে পারছেন না। জায়গা শুনেছেন তো ? লোকাল পেজে দু' কলম মেরে কেটে।

ভূপেন মাথাটা দুলিয়ে হাসির ভাব এনে বলে, দিচ্ছি কচুকাটা করে। 'অবশ্য'তেই তো দেড় কলম। 'অবশ্য' মানেই হল অবশ্য যাবে—কর্তাদের কপি। নগেনবাবু আঁতকে ওঠেন, সেরেছে, দেড় ক-ল-ম ?

এ আঁতকে ওঠাটা রোজকার ব্যাপার। ভূপেন জানে. 'অবশ্য'র জায়গা যেমন করে হোক হবেই। আর পাঁচটা খবর বাদ দিয়েও। জরুরী ? জরুরী আবার কি ? এ কাগজে যা ছাপা হবে তাই খবর, তাই জরুরী সংবাদ। যা কিছু ছাপা হয় না, তা হয় মিথ্যে, না হয় ছাপা হবার যোগ্য নয়। যা ছাপা হয় তাই সত্য। ঘটনা যদি মিথ্যে হয় তবুও সেটা সত্য, অন্তত লোকে তাই মেনে নেবে। সুতরাং নিশ্চিন্তে সাবধানে 'অবশ্য' এডিট করে যাও। আর সব, জায়গা না থাকে, চোখ বুঁজে স্পাইকে গাঁথো। চাকরিটা অন্তত যাবে না। তবু বিবেকে লাগে মাঝে দু-একটা খবর বাদ দিতে।

নগেনবাবু গ্যালি প্রুফ আর ছবি নিয়ে চলে যান প্রেসে।

নিউজ এডিটারের ঘরে ডাক পড়েছে। উঠে যাবার আগে সমরেশ মহীতোষকে কপিগুলো ছিঁড়ে গুছিয়ে রাখতে বলে। পি, টি, আই ও ইউ, পি, আই-এর কাগজগুলো এর মধ্যেই লম্বা হয়ে গেছে হাত পনের। এই তো সবে

শুরু, দশটা কুড়ি।

কী হে অবস্থা কেমন ? জগদীশবাবু শুধোন।

—পঞ্চাশ কলম ম্যাটার আছে। জায়গা তো মোটে কলম বাইশ পাচ্ছি। 'অবশ্য'তেই তো আবার কলম দেড়েক।

ভাসাভাসা ভাবে জগদীশবাবু বলেন, আজে বাজে খবর সব ফেলে দাও।

সমরেশ ভাবে, কোন্‌টা ফেলব কোন্‌টা রাখব, অন্তত দিনের প্রুফগুলোতেও যদি দাগ দিয়ে দিতেন।

জগদীশবাবু বলেন, ছবি আছে খান চারেক, কার্টুনটা পাঁচের পাতায় নিও। আর হ্যাঁ শোনো, কে, জি, লালের একটা স্টেটমেন্ট আছে। ওটা যেন দিও কোন রকম করে। মেজবাবুর বন্ধু লোক, জানো তো।

সিগারেটটা ধরিয়ে টিনটা আবার পকেট থেকে বের করে এগিয়ে দেন সমরেশের দিকে। যেন হঠাৎ মনে পড়লো সমরেশও সিগারেট খায়। সমরেশ তুলে নেয় একটা মার্কোভিচ্‌। কে, জি, লালের স্টেটমেন্টটা তাকে দিতেই হবে, সিগারেট না নিলেও।

সমরেশ টেবিলে এসে বসে আবার। কামরা বন্ধ করে জগদীশবাবু এবার নিউজ টেবিলে আসেন। ওহে, হ্যাঁ, শোনো, ওদের মিটিং-এর খবরটা, আমি বলে দিয়েছি হেমেনকে ছোট্ট করে দু-লাইন দিতে, সাতের পাতায় একটু দিয়ে দিও। একেবারে না দিলে—চলি আমি এবার—ঈস্‌ সাড়ে দশটা বেজে গেল! বড্ড দেরী করে ফেলেছো আজ।

দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসেন আবার জগদীশবাবু। —এই দেখো ভুলে যাচ্ছিলাম আবার। কালকের সেই জগৎজিৎ মিলের স্ট্রাইকের খবরটা দিও না যেন। ওরা আমাদের রেগুলার য়্যাড্‌ভার্টাইজার। এম্‌. ডি.কে শুধিয়ে কাল যা হয় দেখা যাবে। আর হ্যাঁ, জীবন বোসের প্রতিবাদটা জায়গা হলে দিয়ে দিও চার লাইন, এই দশ পয়েন্টের বেশী যেন না হয়। এইটুকু আবার আইন বাঁচিয়ে চলা। গেলেই হল।

একটু হেসে সুধাংশুর দিকে তাকান, কী হে সুধাংশু, খুব ব্যস্ত ?

সুধাংশু ভীষণ মনোযোগ দিয়ে একটা হেডিং-ই বোধহয় ভাবছিল, একটু ওঠার পোজ করে বিনীতভাবে হাসে।

এবার সমরেশ হর্তাকর্তা বিধাতা—নাইট এডিটার। যা খুশি ছাপতে

পারে সে, যা কিছু ফেলে দিতে পারে। কালকের কাগজের সেই স্রষ্টা। তার খুশিমত চললে অবশ্য চাকরিটা টিঁকবে না পরের দিন। তার যা খুশি করার অধিকারটা গরীবের স্বাধীনতার মত। বিদ্রূপের মত খোঁচা দেয়। শ্রমিকদের যেমন বলা যেতে পারে, তোমরা স্বাধীন, ইচ্ছে হয় চাকরি করো, না হয় কোরো না, কেউ বেঁধে রাখছে না তোমাদের; তেমনি সমরেশকে বলা হয়েছে, তুমি তোমার স্বাধীন ইচ্ছামত বুদ্ধি খাটিয়ে কাগজ বের করবে, তবে আমার ইচ্ছার সঙ্গে তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছার যদি গরমিল হয়, সাবধান। চাকরি যেতে পারে, আরো অনেক কিছু হতে পারে।

এগারোটা বেজে গেছে। চা খেয়ে সুধাংশু মহীতোষও এবার কাজে লাগে। এগারোটা থেকে একটা, মেশিনের মত কাজ চলে। রিপোর্টারদের কপি আসতে শুরু করেছে। এদিকে ফরেন নিউজের ভিড়, নেহেরু-রাজেন্দ্র প্রসাদের বক্তৃতা, কাশ্মীর, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা, এরি মধ্যে দুটো একটা স্ট্রাইকের খবর। নিশ্বাস ফেলার সময় নেই কারো। টেলিফোনটা বেজে ওঠে ঠিক এই সময়েই। বিরক্ত হয়ে কাজ করতে করতেই বাঁ হাত তুলে সমরেশ জবাব দেয়, হ্যালো। ···হ্যাঁ, আমি কথা বলছি।

ওপার থেকে কী বললো শোনা যায় না, মহীতোষ শুধু দেখলো সমরেশ চটে গেছে।

—ব্যক্তিগত কথা শোনার সময় নেই আমার, তা ছাড়া আপনাকে আমি চিনি না। বাসায় দেখা করবেন। সরি, জায়গা নেই, আজ কিছু ছাপতে পারবো না। লাইনটা কেটে দিল সমরেশ বিরক্ত হয়ে।

প্রুফ রীডার মন্মথ আসে, দেখুন তো এটা। কেমন যেন মিল্‌ছে না—

সমরেশ হঠাৎ ক্ষেপে যায়—না মেলে, যাতে মেলে তাই করে দিন। এটাও দেখে নিতে পারেন না আপনারা, বি-এ পাশ করে? দেখ্‌ছেন মরবার ফুরসত নেই। এই শম্ভু, কপি নিয়ে যা।

মন্মথ থতমত খেয়ে চলে যায়। কেউ অবশ্য কিছু মনে করে না। অস্বাভাবিক নয় এটা রাতের শিফ্‌টে। এমন যে রিপোর্টাররা, যাদের এক লাইন কাটা গেলে দিনের বেলা মাথা কাটবে, তারাও ভয়ে ভয়ে কপি দেয় সমরেশকে—দাদা, একটু দেবেন ফার্স্ট পেজে, ভাল খবর।

যতীশবাবু শেষ কপি দেন একটার পরে। সমরেশ চাপা দেয় রাগ করে। —ক'টা বেজেছে খেয়াল আছে যতীশদা? এদিকে তো পাতা ছাড়তে এক

মিনিট দেরী হলে কৈফিয়ৎ দিতে হবে। আমার কি ছ'টা হাত না তিনটে মাথা? না মেশিন? কখন এডিট্ হবে, কখন কম্পোজ হবে এটা?

যতীশবাবু সিনিয়ার লোক। বলেন, চটো কেন হে, নাও নাও সিগারেট খাও। কী করি বল, আমাদের কি আর অসাধ এগারটায় বাড়ি যেতে? হয়ে ওঠে না যে।

সমরেশ বলে, কী যে করেন? আমাদের অবস্থাটা তো বোঝেন না। নগেনবাবু খাঁড়া উঁচিয়েই আছেন। দিয়ে দিচ্ছি, প্রুফ পড়া না হলে আমি জানি না কিন্তু।

কপিটা সুধাংশুকে দিয়ে কাজে ডুবে যায় আবার। মেশিনের চেয়ে দ্রুততর কাজ হয় যেন। লাইনো অপারেটারদের কতখানি কম্পোজ করতে হবে তার একটা সীমা আছে, নেই সাব-এডিটরদের কাজের হিসেব। জায়গা কম থাকলে আরো মুশকিল। কী ফেলবে কতটুকু দেবে, কতটা কাটবে বিচার করতে সময় লাগে। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে দরকারী পয়েন্ট, খবরটুকুর জিস্ট বার করতে করতে হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। তবু কাগজ ঠিকই বার হয়। 'অবশ্য'ও ছাপা হয়, দেশী-বিদেশী বড় খবর, এমন কি বিবৃতি-প্রচার তাও পায় লোকে সমরেশদের কাগজে।

মাঝে মাঝে সাব-এডিটারদেরই আশ্চর্য লাগে। সব কাগজের সব সাব-এডিটারই কি একই চিন্তা করে? তাদের বিচার বুদ্ধি কি এক, একই মেশিন থেকে বেরিয়ে আসা এক একটি নিখুঁত যন্ত্র কি তারা? সম্পাদকীয়, ছোটো-খাটো খবর, বিবৃতি আর পলিসি বাদ দিয়ে খবরগুলো কেমন যেন প্রায় একই রকম হেডিং নিয়ে বেরিয়ে আসে একইভাবে সব কাগজে।

যন্ত্রের মতই কাজ চলে, অথচ কী নিস্তব্ধ মনে হয়। টেলিপ্রিণ্টার ছুটো চলেছে ঝক্ঝক্ খট্খট্ করে, তাতে নিস্তব্ধতার তপোভঙ্গ হয় না। অন্ধকার ঘরে ঘড়ির টিকটিক্ যেমন নৈঃশব্দ্যেরই অঙ্গ, তেমনি চড়া আলোর মধ্যেও এই টেলিপ্রিণ্টারের ঝক্ঝক্। সাব-এডিটারের কাজের কোন ব্যাঘাত ঘটায় না, যদিও বাইরের কেউ কেউ এলে অস্বস্তি বোধ করবে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে যেন ভূপেন চেঁচিয়ে ওঠে, ও সমরেশবাবু, দেখুন দেখি এটা। জয়লক্ষ্মী মিলের সামনে মারামারি হয়েছে, ফায়ারিং লাঠি চার্জে চার-জন সিরিয়াসলি উণ্ডেড বলছে, একজন মহিলাও আছেন।

—হ্যাঁ, কী বলছেন? জগৎজিৎ মিলের কোন খবর যাবে না, মালিক

পক্ষের স্টেটমেণ্ট যাচ্ছে, শুনলেন না? —কাজ করতে করতে মাথা না তুলেই সমরেশ বলে।

ভূপেন বলে, না, না, জগৎজিৎ নয়, সে আমি জানি। জয়লক্ষ্মী মিল। দেখুন একবার।

সমরেশ তাড়াতাড়ি কপিটায় চোখ বুলিয়ে নেয়। রেজিষ্টার্ড ইউনিয়নের প্যাডে সই করা কাগজ। কিন্তু জায়গা কোথা? তা ছাড়া ইউ-পি-আই পি-টি-আই দিলেও বা কথা ছিল। এসব ব্যাপারে নিজে রিস্ক না নেওয়াই ভাল। বলে, না, জগদীশ বাবুকে না দেখিয়ে এ খবর দেওয়া যাবে না।

ভূপেন বলে, নিষেধ যখন নেই, দিন না দিয়ে—

সমরেশ বলে, একে জায়গা নেই, তারপর গোলমেলে ব্যাপার। রেখে দাও। কাল জগদীশ বাবু যা হয় করবেন।

—তা দেবেন কেন? কোথায় কার 'অবস্থা', কার বক্তৃতা, কার শ্রাদ্ধ—

সমরেশ হাসে। ভূপেন এখনো রাজনীতি করে কিছু কিছু। বলে—দাও না, দিয়ে দাও তোমার লোকাল পেজে। আমাকে শুধোচ্ছ কেন?

—হ্যাঁ, জায়গা কত?

—কেন, 'অবস্থা' একটা তুলে দাও না হে। মহীতোষ বলে ভূপেনকে ক্ষেপাবার জন্ত।

সমরেশ দেখে আড্ডার আবহাওয়া আসছে। তাড়া দিল মহীতোষকে, কই, হল কাশ্মীরটা?

—এই যে হেডিংটা দিচ্ছি।

আবার কাজের মধ্যে ডুবে যায় সবাই। টেলিগ্রাম আসে একসঙ্গে চারটে। সমরেশ তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে একটা সুধাংশুকে দেয়।

—ডবল কলম না সিঙ্গল?

—জায়গা কোথায়? সিঙ্গল কলম দাও, হেডিংটা একটু বড় করে দিও। ঈস্, সবগুলোই নিতে পারলে হত।

সমরেশ এবার প্রেসে যায়। লোহার ফ্রেমের মধ্যে কুরুক্ষেত্র শুরু হয়ে গেছে। দু'জন মেকআপম্যান্ গলদঘর্ম হয়ে উঠেছে। কারেকটার চারজন ঝুঁকে পড়েছে একসঙ্গে। ওরি মধ্যে গ্যালি এসে বসছে। জায়গা মেপে সমরেশ হতাশ হয়ে পড়ে।

নগেনবাবু গজ গজ করতে করতে তাল রাখার চেষ্টা করছেন, এটা ওর নীচে চলে না যায়, জরুরী খবর পড়ে না থাকে। —কাটুন দেখি এটা ইঞ্চি ছয়েক।

হঠাৎ থেকে থেকে অভ্যাস বশে হাঁক দিয়ে ওঠেন, ওরে ঘড়ির কাঁটা যে ঘুরে গেল। ভাগ্ ভাগ্ ছয়ের পাতা ছাড়, এই শকুনগুলো। কারেক্টাররা ক্ষিপ্রহাতে শ্যেনদৃষ্টিতে ভুল শোধরায়। পাতা আঁটতে আঁটতে মেজ প্রিণ্টার মাধব ডাক দেয়—নকুল, ছয়ের পাতা নিয়ে যা।

এদিকে টেলিপ্রিণ্টারে চোখ বুলিয়ে মহীতোষ আঁতকে ওঠে, সেরেছে রে, ডবল কলমটা ভাঙতে হবে।

কপিটা ছিঁড়ে নিয়ে দৌড়ে প্রেসে যায় মহীতোষ—ও সমরেশ, কাশ্মীরের ডবল কলমটা ভাঙতে হবে যে।

—খুন করে ফেলবে তাহলে নগেনবাবু, দেখি।

সমরেশ ঘড়ির দিকে তাকায়—দুটো পঁয়ত্রিশ। মুহূর্তের মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। যুদ্ধক্ষেত্রে যেন শত্রুর মুখোমুখি ওরা। পেছোবে না এগিয়ে গিয়ে আক্রমণ করবে? নাঃ সময় নেই। মেকআপ ভাঙতে গিয়ে দেরী হয়ে যাবে, শেষ পর্যন্ত হয় খবরটা যাবে না, নয় পাতা লেট হয়ে যাবে।

—ওহে, এটা লেট নিউজ করে দাও। সমরেশ কপিটা ফেরত দেয় মহীতোষের হাতে।

স্টিরিও আর ম্যাঙ্গল মেসিনের শব্দ উঠেছে, নীচে প্লেট কাটার তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ শোনা যায়। রোটারি ঘরেও কাজ শুরু হল। তীব্র চোখ-ঝলসানো আলোটা জ্বলে উঠেছে।

আরো আধ ঘণ্টা পরে কাজ শেষ হল সমরেশের। ভূপেন আর মহীতোষের কাছে বাড়ি; ওরা চলে গেছে। সুধাংশু যথারীতি ডিক্সনারী মাথায় দিয়ে টেবিলের ওপরই ঘুমিয়ে পড়েছে। টেলিপ্রিণ্টার দুটো আর একবার দেখে চেয়ার জোড়া দিয়ে শুয়ে পড়ে সমরেশ। আঃ কী আরাম। কিন্তু এখুনি ঘুমুতে পারবে না সমরেশ, কাগজে ছাপা হয়ে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। হঠাৎ যদি কোন বড় খবর এসে পড়ে, দিতে হবে যেমন করেই হোক্। বড় খবরে মার খেলে কথা শুনতে হবে। কাগজ ছাপা হয়ে যাবে সোয়া চারটার মধ্যে, ট্রাম চলাও শুরু হবে। কাগজ নিয়েই তাই প্রথম ট্রামে মেসে

ফেরে সমরেশ।

কাগজ এলে একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নেয়। মেক্‌আপটা মনোমত হয়নি। কী করেই বা হবে? দু-দিকে দুকলমের ওপর বিজ্ঞাপন থাকলে সে আর কী করতে পারে।

মেসে এসে শুতে শুতে পাঁচটা। তবু ঘুম আসে না। এত উত্তেজনার পর পায়ের নখ থেকে মাথার চুল অবধি উদ্ধত হয়ে থাকে। মীরার কথা মনে পড়ে এবার।

কবে যে পাশের খবরটা পাওয়া যাবে ওর? কবে ওরা ঘর বাঁধবে! এই মাইনেয় দু'জনের চলা অসম্ভব ঘর ভাড়া করে। তাই সে থাকে মেসে, মীরাকে থাকতে হয় বরানগরে দাদার কাছে। মীরা পাশ করতে পারলে একটা মাস্টারি অবশ্যই জুটবে। তারপর? তারপর পাঁচ বছরের প্রত্যাশার পরিসমাপ্তি। একখানা ছোট্ট ফ্ল্যাট বা অন্তত একখানা ঘর। মীরা আর সমরেশ।

মীরা কাজ শুরু করেছে আবার। সমরেশ কতদূরে চলে এসেছে। নাইট ডিউটির পর টিউশনি করে, অনুবাদ করে দেওয়া ছাড়া আর কীই বা করতে পারে সে? এ ছাড়া উপায়ই বা কী? মা-বাবা বিধবা বোন, আর ভাইদের দায়িত্ব তো এড়াতে পারে না সে। ·· ইস্ আট দিন হয়ে গেল দেখা হয়নি, আসে না কেন মীরা? এ পাড়ায় কি আসতে নেই পরীক্ষা হয়ে গেছে বলে? অভিমান করতে গিয়েও পারে না সমরেশ। হয়তো আর্থিক সমস্যাটাই মীরার না আসার কারণ। কাল একবার দেখা করতেই হবে—ছুটি আছে······।

নয়টায় ঘুম ভাঙে অবনীর ডাকে। রাঙা জবার মত চোখ দুটো রগড়ে উঠে বসে সমরেশ। বলে, কী ব্যাপার রে, সকাল বেলা? বোস্, চা আনতে বলি।

অবনী বলে, চা পরে খাওয়া যাবে, মুখটা ধুয়ে আয় তুই। বেরোতে হবে।

অবনীর মুখের দিকে তাকিয়ে আতঙ্কিত সমরেশ বলে,—কীরে, ব্যাপার কী বলতো?

—কেন, তুই জানিস্ না কিছু? আপিসে খবর পাস্‌নি? তোকে তো চিঠি

পাঠিয়েছিল, সুনীল বলল—

—না তো, কেন ? কি হয়েছে ?

মীরা কাল গুলি খেয়েছে, অবনী আস্তে আস্তে বলে।

এঁ্যা ?—হেঁচকা টানে পাঞ্জাবীটা টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ায় সমরেশ।

বুক পকেট থেকে কাগজপত্রগুলো ছড়িয়ে পড়ে মেঝের ওপর। কুড়িয়ে নিতে গিয়ে সমরেশ দেখল কাল রাতের না খোলা সেই খামটা রয়ে গেছে।

বিরক্ত মুখে তবু ছিঁড়ে ফেললো সমরেশ চটিটা পরতে পরতে। কে একজন সুনীলবাবু লিখেছেন মীরার নাম করে, ফায়ারিং-এর খবরটা পাঠানো হল, যেন ছাপা হয়।

হঠাৎ ওর মনে পড়ে, তাই তো, একটা ফোনও এসেছিল। তাছাড়া মীরার নাম ছিল জয়লক্ষ্মী মিলের খবরটায়। হ্যাঁ, আহতদের তালিকায় প্রথমেই ছিল মীরা বসুর নাম। তাড়াতাড়িতে কাজের চাপে খেয়াল করেনি সে। নিজের ওপর রাগ হয় সমরেশের। তারপর মনে হয় খেয়াল করলেই বা কী করতে পারত সে ? ডিউটি ছেড়ে বের হতেও পারত না, খবরটা ছাপতেও পারত না।

দিনের পর দিন

মোড়ের মাথায় জরাজীর্ণ থমথমে বাড়ীটায় হঠাৎ হাসিখুশীর আভাস দেখা যাচ্ছিল। মাস দুই ধরে গত সপ্তাহ থেকে বুঝি আনন্দের জোয়ার এসেছে। উপ্‌ছে পড়ছে এতদিনের স্তব্ধ রহস্যঘেরা প্রাসাদটার সবে রঙ-করা দেয়ালের বাঁধন ডিঙিয়ে, মাধুরীর বান্ধবী সুমতিদের গলি পর্যন্ত। আর সুমতি মারফৎ মাধুরীদের ছোট্ট নিরিবিলি ফ্ল্যাটটার দোতালায় এই বারান্দা অবধি।

সুমতিদের বাড়ী থেকে ফিরে এসে মাধুরী বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই হঠাৎ-খুশী বাড়ীটার ঘ্রাণ নেবার চেষ্টা করে।

এমনি হয় মাধুরীর। তার পরিচ্ছন্ন ছোট্ট সংসারের অন্তরঙ্গতার মধ্যেও কেমন যেন একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস লুকিয়ে থাকে, কোলাহলমুখর বিয়েবাড়ীর উৎসবের ছোঁয়া লাগলেই মাথা তোলে। সে কি তার বিয়েতে উৎসবের অভাব ঘটেছিল সেই জন্য ? না, তার জন্য দুঃখ নেই মাধুরীর। নিজেই প্রায় জোর করে বিয়ে করেছিল সুখময়কে, মা-বাবা আত্মীয়স্বজনের অমত সত্ত্বেও। সুখময়ের ভালবাসায় কোন ফাটল ধরেছে সে কথাও ভাবতে পারে না মাধুরী। তবু যেন নিজের মনের মধ্যে কোথায় একটা কাঁটা থেকে থেকে ব্যথা জাগায়, যেমনটি ঠিক ভেবেছিল তেমনটি যেন হয়নি। না, হয়নি বললে ভুল হবে। হচ্ছে না। প্রথম দিকের সেই তৃপ্তিতে যেন ভাটা এসেছে। সে কি তৃপ্তির অবসাদ, না দৈনন্দিন ঘনিষ্ঠ জীবনের একঘেয়ামির অভিশাপ ? সুখময়কে যেন আগের মত ভালবাসতে পারছে না মাধুরী, অথচ চাইছে। ওরা যেন সাধারণ, অতি সাধারণ, ছোট হয়ে যাচ্ছে দিনে দিনে পরস্পরের কাছে। অথচ কী ভেবেছিল ওরা--কত' কী স্বপ্ন ছিল।

বিবাহোৎসবের ছোঁয়া লাগলেই তাই আজকাল মনে মনে ভাবে মাধুরী, ওদের এই উচ্ছলতা ক'দিন টিকবে ? কতদিন ওরা পরস্পরকে ভালবাসতে পারবে—ঠিক মাধুরী আর সুখময় যেমন বাসতো বিয়ের আগে থেকে দু'তিন বছর পরে পর্যন্ত ? বিশ্লেষণ করে দেখতে চেষ্টা করে, যে দুটি জীবন চিরকালের জন্য মিলিত হলো তাদের মধ্যে মিল কতটুকু, ভালবাসার প্রেরণা কতখানি।

বিশেষ করে সুমতির কাছ থেকে বিশ্বাস-বাড়ীর নতুন বৌ সম্বন্ধে যে তথ্য সে সংগ্রহ করেছে, সেইগুলিই মনের মধ্যে আলোড়ন জাগায়। যেমন আকাট মূর্খ কুশ্রী ব্রজহরি, তেমনি শিক্ষিতা সুন্দরী হয়েছে ওর বৌ। মাধুরী আশ্চর্য হয়, শিপ্রার মত মেয়ে ব্রজহরিকে বিয়ে করতে গেল কোন্ কারণে? ব্রজহরি কৃতার্থ হয়েছে, কিন্তু শিপ্রা কী দেখেছে ব্রজহরির মধ্যে? কোনদিন এক মুহূর্তের জন্যও কি সে ভালবাসতে পারবে ব্রজহরিকে?

সুমতি বলে, টাকার জন্য। মাধুরী তা বিশ্বাস করে না। যত গরীবই হোক শিপ্রার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে কোন অবস্থাপন্ন ছেলেকে চাইলেই পেতে পারতো। তা ছাড়া সুমতিই বলেছে, এমনি বেশ ভালো মেয়েটি। নিজে সে দেখে এসেছে।

এরি মধ্যে কখন যে বেলা গড়িয়ে পাঁচটার কাঁটা পার হয়ে গিয়েছে খেয়াল হয় নি। যখন খেয়াল হলো তখন সুখময়ের অফিস-ক্লান্ত চেহারাটা মোড়ের মাথায় দেখা দিয়েছে।

দ্রুত হাতে স্টোভ্ জ্বালালো মাধুরী, এখন আর উনুন ধরানোর সময় নেই। তার চেয়ে ক্ষিপ্র হাতে বেণীটা জড়িয়ে নিল, চুল বাঁধার অবসর নেই।

বাইরে চা ছাড়া আর কিছুই খায় না সুখময়। কখনো বলে, বাইরের খাবার ভাল লাগে না। কখনো বলে ক্ষিধে পায় না। অথচ বাড়ী এসে খাবার পেতে এক মিনিট দেরী হলেই—। জানে মাধুরী, প্রথম কৈফিয়ৎটা আংশিক সত্য, দ্বিতীয়টা নির্জলা মিথ্যা। আসলে ওর খাওয়া হয় না পয়সার অভাবে, রোজ রোজ বাইরে খাওয়ার খরচ তো কম নয়। কী করে কুলোবে সুখময় এই সামান্য মাইনের চাকরীতে?

সুখময় মুখ হাত ধুতে ধুতেই খাবার তৈরী হয়ে যায় মাধুরীর।

প্লেটটা নিয়ে যাচ্ছিল মাধুরী, সুখময়ের তখন খেয়াল হয়।

—কৈ তোমার নেই?

মাধুরী বলে, আছে আছে, তোমায় ভাবতে হবে না। ঈস্ এতক্ষণে কথা ফুটলো বাবুর মুখে। দাঁড়াও, চা নিয়ে আসি, খবর আছে। এক মিনিট।

এক মিনিট নয়, মিনিট সাতেক পরে যখন মাধুরী চা নিয়ে এলো তখন এক দফা প্রসাধন হয়ে গেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে সুখময় বলল, আজ তোমায় যেন—

ঝঙ্কার দেয় মাধুরী। আহ্ হা রোজই আজ তোমায় যেন—

তারপর গোপন কথা বলার ভঙ্গীতে বলে, কিন্তু পাড়ায় যে সত্যিই বিদুষী উর্বশী এসেছে, সে খবর রাখো ?

সিগারেট ধরাচ্ছিল সুখময়, ভ্রূ কুঁচকে বললে, তাই নাকি ? নতুন ভাড়াটে বুঝি ? কোন বাড়ীটায় ? বৌ না মেয়ে ?

চায়ের কাপ দুটো সরিয়ে চেয়ারটা টেনে এনে মাধুরী বললে, বৌ বৌ, নতুন বৌ। বিশ্বাসদের বাড়ী বিয়ে হলো না সেদিন—

কৃত্রিম হতাশায় গা এলিয়ে দিলে সুখময়। —ওহ্ নতুন বৌ। পুরানো হলেও না হয় দেখা যেত চেষ্টা করে।

—আহ্ হা, কথা কিছু আটকায় না মুখে, যে চেহারা হচ্ছে দিনে দিনে—

—তা, তোমার ব্রজহরি বিশ্বাসই বা কি কন্দর্পকান্তি ?

সুখময়ের ইজিচেয়ারের হাতলে এসে এবার বসলো মাধুরী। —সেই কথাই তো বলছি। অমন সুন্দর লেখাপড়া জানা মেয়ে, শুনছি এম. এ পাশ। কিন্তু ব্রজহরি বিশ্বাসকে বিয়ে করতে গেল কোন দুঃখে ? কী কপাল বলো তো।

সুখময় বললে, কেন খারাপটা কি কপাল ? তিনখানা বাড়ী এ পাড়াতেই, আরো ক'টা আছে কে জানে। অতো বড়ো হার্ডওয়ারের দোকান। এর চেয়ে সুখ তো আই, এ, এস, বিয়ে করেও পেতো না। মাধুরী বললে, ঈস্ টাকাতেই বুঝি সব ? তোমরা তো ওই জানো। ওই বিদঘুটে চেহারা, আই, এ, ফেল—

মাধুরীকে ক্ষেপাবার জন্যে দার্শনিকের ভঙ্গীতে বললে সুখময়—হ্যাঁ, জানা আছে আমার মেয়ে-চরিত্র। শাড়ী-বাড়ী-গয়না, পাই না তাই চাই না।

চোখ পাকিয়ে মাধুরী বললে, বাজে কথা বোলো না। আমার কতো ভালো ভালো সম্বন্ধ এসেছিল, জানো ?

সত্যিই জানে সুখময়, ভালভাবেই জানে। সারা বাড়ীর বিরুদ্ধে লড়েছিল মাধুরী সুখময়ের জন্য।

আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বললে, পাগল কোথাকার। কথার কথা বললাম একটা, অমনি ফোঁস।

মাধুরী-সুখময়ের অতীত স্মৃতির বন্যায় বিশ্বাসদের নতুন বৌ-এর আলোচনা রয়ে গেলো সেদিনের মতো।

এরপর মাধুরী আর সুখময় একদিন স্বচক্ষেই দেখলো নতুন বৌ শিপ্রাকে।

রবিবারের বিকেল। সিনেমা থেকে ফেরার পথে মোড়ের মাথায় একেবারে মুখোমুখি। ব্রজহরির নতুন কেনা মোটরটা এক মুহূর্ত আটকে গিয়েছিল ভীড়ের জন্য। গলির মধ্যে ঢুকে মাধুরী বললো, দেখলে? গাড়ীটা নতুন কিনেছে বৌয়ের জন্য।

দেখেছে বৈকি সুখময়। অমন মেয়ে এমনিতেই নজর যায়, তাতে ব্রজহরি বিশ্বাসের মতো কাঠ কয়লার পাশে। কাঠ কয়লার কথাই মনে হলো সুখময়ের, কারণ শিপ্রার অগ্নিশিখার পাশে ব্রজহরিকে দেখাচ্ছিল ভিজে ভিজে নিস্তেজ।

মিথ্যা বলেনি মাধুরী, ব্রজহরির পক্ষে শিপ্রার মতো শিক্ষিতা সুন্দরী মেয়ে বেমানান, একেবারে অসহ্য বেমানান। কিন্তু কেন গেল শিপ্রা ব্রজহরিকে বিয়ে করতে? গরীব বলে? ওর মতো মেয়ে যে কাউকে বিয়ে করে মাস্টারী করেও সংসার চালাতে পারতো।

বাড়ী ফিরে বললো, দেখলাম তোমার নতুন বৌকে। সুন্দরী নিশ্চয়ই, হাজার বার মানতে হবে, তবে করুণার পাত্রী নয়।

মাধুরী বললো, তবে? খুব জাঁহাবাজ মনে হলো বুঝি তোমার?

—তা জানি না। পরস্ত্রী সম্বন্ধে ও কথাটা না বলাই ভালো। তবে ওকে দেখে বুঝতে পারলাম কেন ব্রজহরিকে বিয়ে করেছে।

—কেন, তুমি চেনো নাকি? কাপড় বদলানো বন্ধ রেখে মাধুরী এসে দাঁড়ালো মুখোমুখি।

—চিনি না। তবে মুখ দেখলে বুঝতে পারি।

এই! সন্দেহ শুধু! চটে উঠলো মাধুরী। —কি বুঝেছ?

নির্বিকার চিত্তে জামাটা টাঙিয়ে রেখে ধীরে ধীরে ব্যাঙ্গের স্বরে সুখময় জবাব দিলো, কেন বুঝতে পারছো না?

—না। মনটা ভারী ছোট হয়ে গিয়েছে তোমার আজকাল। বলতে চাইছো তো মেয়েরা টাকার জন্যে, সুখের জন্যে বিয়ে করে, ও তাই করেছে—

হেসে সুখময় বললো, এই না হলে মেয়ে বুদ্ধি! তোমার বিদুষী উর্বশী বৌটি ব্রজহরির মতো আকাটকে বিয়ে করেছে উড়ে বেড়াতে পারবে বলে, বুঝতে পারছো না? দেখছো না নতুন গাড়ী এসেছে, আগাছা পরিষ্কার ক'রে

বাগান হচ্ছে ব্রজহরির বাড়ীতে, ফরাসের বদলে সোফা সেট, দামী আয়না আসছে, রাস্তা থেকেই তো দেখা যায়—

ক্রুদ্ধ হয়ে মাধুরী বললো, তুমি আসলে ঈর্ষা করছ ব্রজহরিবাবুকে।

সুখময় হেসে বললো, আর তুমি করছ ব্রজহরির বৌকে।

সে রাত্রে মাধুরী রাগ করে কথা বললো না।

ঠিক এই কারণেই, সুখময় মনের উদারতাটুকু হারিয়ে ফেলেছে বলেই, মাধুরীর দীর্ঘশ্বাস।

এতদিন খবর দিয়ে এসেছে মাধুরী, এবার সুখময়ের পালা।

মাস তিনেক পরে সুখময় একদিন রাত্রে ফিরে বললো, শুনেছো, তোমার উর্বশী যে আজকাল নিজেই মোটর চালাচ্ছে।

সেদিন মাধুরীর মেজাজ ভাল ছিল না। চড়া গলায় জবাব দিলো, নিজের থাকলেই চালায়। দাও না কিনে আমিও শিখে নেবো দু'মাসে।

সুখময়ের মনটা কিন্তু খুসী ছিল বোনাস পাওয়ার আনন্দে। হেসে বললো, মোটর না পারি মটর মালা একটা দিতে পারি।

মেজাজটা খারাপ ছিল হাতে টাকা না থাকার জন্তেই। টাকা পেয়ে মাধুরীর মনের কালো মেঘটুকু কেটে গেলো। টাকাটা হাতে নিয়ে বললো, পেলে তাহলে সত্যি? আগে কিছু জানাওনি তো।

সুখময় অফিসের পোষাকেই গা এলিয়ে দিলো চেয়ারে। —অবাক করে দেবো বলেই তো জানাইনি।

টাকাটা তুলে মাধুরী রেখে শুধালো, কী বলছিলে? নতুন বৌ মোটর চালাচ্ছিল, ব্রজহরি বিশ্বাসকে পাশে রেখে?

সুখময় বলল, বিশ্বাস পাশে থাকলে আর মোটর চালিয়ে আনন্দ কি? একাই চালাচ্ছিলেন বিশ্বাস-মহিলা।

আকাশ থেকে পড়লো মাধুরী। একা!

—তাই তো বলছি।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে মাধুরী আস্তে আস্তে তিক্ত গলায় বললে, ও তাই। তাই বেছে বেছে বিশ্বাসের মত গোবেচারীকে বিয়ে করেছে।

বিশ্বাসবাড়ীর নতুন বৌ সম্বন্ধে মাধুরীর কৌতূহলের এইখানেই সমাপ্তি হতো যদি না আরো চমকপ্রদ সংবাদটা সুমতি মারফৎ এসে ওর কানে পৌঁছতো।

মাধুরী বললে, না, না একি বলছিস তুই ! একী হয় ? সম্ভব কথা একটা ?

সুমতি বললো, বিশ্বাস না হয়, চল্ না একদিন বিকেল বেলা আমাদের বাড়ী। ছাদ থেকে দেখাবো তোকে—নতুন বৌ-এর মুখে হাসি ফুটেছে আজকাল—ছেলেটাকে নিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়ায়, হাওয়া খেতে যায় বিশ্বাসকে পাশে নিয়ে—

—বলিস কি ? আজকাল বিশ্বাসকে সঙ্গে নিয়ে যায় ?

—যাবে না কেন ? তুই বুঝি জানিস না, তখন একা একা তো ছেলেটাকে দেখতে সেখানেই যেত। বিশ্বাস যখন মেনে নিয়েছে, কাছাকাছি পেয়েছে —তা যাস একদিন, দেখবি। দেখেই বুঝতে পারবি। তা ছাড়া জানতে তো আর বাকী ছিল না কারো। কতদিন আর লুকোবে ঝি-চাকরের কাছে। আমার কাছে সব খবরই আসে।

সুমতি চলে গেলে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলো মাধুরী। নতুন বৌ নয়, ব্রজহরির কথাটাই ভাবছিল সে। পারলো সেকালের গোঁড়া বনেদী বংশের ছেলে ব্রজহরি বিশ্বাস এত বড় অনাচারটা মেনে নিতে ? এত অন্ধ মূর্খ ব্রজহরি ? বোকা বোকা, নিরেট গবেট ব্রজহরি।

খবরটা শুনে সুখময়ের কিন্তু অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। চায়ের কাপটা মুখ থেকে নামিয়ে অবাক হয়ে বলল, ঠিক বলছ তুমি ? ব্রজহরি জেনে শুনে—? আশ্চর্য তো।

মাধুরী বলল, কী বোকা দেখ। ও ভেবেছে উদারতা দেখিয়ে মন জয় করবে ওই মেয়ের। ঠিকই বলেছিলে তুমি, ও মেয়ে সহজ নয়। উড়ে বেড়ানোর জন্যই গোবেচারা লোকটাকে—ও কি চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল যে, কী ভাবছ ?

চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে সুখময় বললে, না মাধু, ব্রজহরিকে যত বোকা আমরা ভেবেছি তত বোকা নয়—

—বোকা নয় ?

—না। বোকা হলে, ওর কলঙ্কের জন্যে শিপ্রাকে শাসনে রাখতে পারতো। কিন্তু ভালবাসা পেত না। তা করেনি ও। এই উদারতা দিয়ে নিজেকে কতখানি উঁচুতে তুলে ধরেছে দেখ। শিপ্রা এবার কোনদিন আর অবজ্ঞা করতে পারবে না ব্রজহরিকে—

—তার মানে, তুমি বলছ, শিপ্রা সত্যিই ভালবাসবে ওকে ? চায়ের কাপটা শেষ করে সুখময় বললে, হ্যাঁ। ব্রজহরির মধ্যে শ্রদ্ধা করার মত কিছু

পেয়েছে বলেই—

—ভ্রূভঙ্গী করে মাধুরী বললে, ব্রজহরিবাবু চরম উদারতা দেখিয়েছেন, সেকথা আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু শিপ্রা কি সেই মেয়ে? হয়তো কৃতজ্ঞতা একটু থাকবে, কিন্তু কৃতজ্ঞতাটা, বা ধরো শ্রদ্ধাটাই তো, ভালবাসা নয়।

—তা নয়, কিন্তু সেটাই মূল ভিত্তি। মনে আছে মাধু? আমাদের বিয়ে ঠিক হয়ে যাওয়ার পরেই আমার ওই চাকরীটা পুলিশ রিপোর্টে চলে যায়, তারপর তোমার অনেক ভাল সম্বন্ধ এসেছিল, তুমি বলেছিলে আমাকেই বিয়ে করবে—

উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মাধুরীর মুখ। বলে, আর তুমি তারপর কী করেছিলে মনে নেই?

কাছে টেনে নিয়ে গভীর স্বরে সুখময় বলে, হ্যাঁ মাধুরী, মনে আছে বৈকি, তাইতো বলছিলাম—কিন্তু আমরা যেন কেমন যান্ত্রিক, সংকীর্ণ হয়ে যাচ্ছি। শুধু দোষত্রুটিটাই নজরে পড়ে—শিপ্রা ব্রজহরি দুজনকেই কী ভাবতাম আমরা, অথচ কত মহৎ দেখ তো।

সুখময়ের বুক থেকে মুখ তুলে মাধুরী বলে, কিন্তু শিপ্রার মধ্যে—? হেসে বললো সুখময়, আছে বৈকি মাধু। ওর মধ্যেও মহত্ব আছে বৈকি। উড়ে যদি বেড়াতে চাইতো তবে কি সে নিজের কলঙ্কের নিদর্শন ওই ছেলেটিকে ভুলে যেতে পারতো না? নিষ্ঠুর যারা তারা মুছে দেয় সে কলঙ্ক, যাদের একটু মায়া আছে তারা অনাথ আশ্রমে দিয়ে কর্তব্য শেষ করে। শিপ্রা তা পারেনি; এতখানি সুখ ঐশ্বর্যের মধ্যে বসেও, সব কিছু হারাবার বিপদ মাথায় নিয়েও সে ব্রজহরিকে বলেছে—

স্বপ্নাবিষ্ট স্বরে মাধুরী বলে, তাই তো। এদিকটা তো আমি ভাবিনি। গালাগালিই দিয়েছি শুধু ওকে—সত্যি কত ছোট হয়ে গেছি আমি—সুখময় বলে, তুমি শুধু নয়, আমিও। আমি জানি মাধু। তোমার আমার মাঝখানে—

দু'হাত দিয়ে সুখময়ের মুখটা বন্ধ করে দেয় মাধুরী, ছি ছি, না না।—না, নয়, মাধু। আমি অনুভব করেছি আমি ছোট হয়ে যাচ্ছি, তুমিও, হ্যাঁ তুমিও, ছোট হয়ে যাচ্ছিলে। পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলছিলাম। আমরা পরচর্চায় আনন্দ পেতাম, নিজেরা ছোট হয়ে যাচ্ছি জেনেও—

নিবিড়ভাবে সুখময়ের মধ্যে মিশে গিয়ে মাধুরী বলে, না, না, ছোট তুমি নও। ছোট হলে একথা কখনই বুঝতে না।

বিবেক

জামা-কাপড়ের ব্যবসা বিনোদের। ব্যবসা মানে তেমন দোকান সাজিয়ে জমকালো কিছু নয়, রাস্তার ধারে একটা বারান্দার কোণে শ' চারেক টাকার সওদা নিয়ে তার ব্যবসা।

বৌটার যা দু একখানা গহনা ছিল তাই বিক্রী করে অনেক ভেবে চিন্তে জামা-কাপড় ফিরি করেছিল প্রথমে। তারপর এই দোকান। ক'মাস চেষ্টা ক'রে দেখেছে ফিরি করার ঝামেলা অনেক। খাটুনি বেশী, লাভ কম। মা-ঠাকরুণরা সওদা করতে ওস্তাদ, চট ক'রে দাম বলে বসে অর্ধেক। বাজার থেকে বেশ কিছু সস্তা না পেলে কেনে না। বলে, এতো দামেই যদি নেব তো দোকান থেকেই নেব। তারও পরে আর একটা বড় কথা হচ্ছে ধার। মা-ঠাকরুণদের কাছে পয়সা থাকে না, অথবা থাকলেও দেয় না। ফিরিওয়ালার কাছে পয়সা ফেলে রাখা যায়। নগদ দামে কিনতে হ'লে পাঁচ দশটা দোকান ঘুরে বাজার থেকে কেনাই ভাল। হাতে পয়সা না থাকলে অথবা সস্তা পেলে তবেই না লোকে ফিরিওয়ালার কাছে কেনে।

অনেক কষ্টে জায়গা জুটিয়েছে। কিন্তু বিক্রী বাটা বড় কম। আর যত দরকষাকষি এইখানে। রেশন কেনো বাঁধা দর, ঘি নুন তেল চিনি যা দাম চাইবে তাই দেবে, ওষুধ কিনতে যাও তো বাঁধা দরের ওপরেও কিছু দাও। কিন্তু এখানে এসেই যত ছেকড়াছেকড়ি।

তবু টিকে আছে বিনোদ, এছাড়া অন্য উপায় নেই বলে। এক ভরসা পুজোর সময়টা আর শীতের মুখোমুখি। যা দু'টাকা আসে তাই ভাঙিয়েই সারা বছরের ধারটা সামাল দিতে হয়।

এইতো ভাদ্র মাসের দশ তারিখ। এবার বড্ড দেরী পুজোর, সেই আশ্বিনের আঠাশে। এ দুটো মাস আর কাটতে চায় না। বড জোর চারটে গেঞ্জি, দুখানা গামছা, একটা ওয়াড়, ব্যস্ এই হলো বিক্রী। ক' পয়সাই বা থাকে তাতে? না হয় এক টাকা বড় জোর দু'তিন টাকা।

কিন্তু আজ বোধ হয় হতভাগা বৃষ্টির জন্ত তাও হলো না। ছাট বাঁচাতে অয়েল ক্লথটা চাপা দিয়েও কোলের কাছে একটু খুলে রাখতে হয়েছে যাতে লোকে বুঝতে পারে জামা কাপড় পাওয়া যায় এখানে। শাড়ী ক'খানা আর দু একটা ফ্রক-ব্লাউজ কোলাপ্সিবল গেটটার গায়ে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে, ওগুলো ভিজবে না।

একটা পয়সা বিক্রী হয়নি আজ সারাদিনে। বিষ্টি-বাদলার দিনে আবার খদ্দের ডাকতেও লজ্জা করে, কেমন কটমট করে তাকায় কেউ কেউ। ও যেন ভিক্ষে চেয়েছে। শুধু পথচারী লোকের মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিনোদ বোঝবার চেষ্টা করে ওদের মধ্যে কারো কাপড়-জামার দরকার আছে কিনা।

অফিসের ভিড় শেষ হয়ে গেল। আজ কি আর কেউ বেরুবে বাড়ী ছেড়ে ?

সাতটা নাগাদ ধড়ে প্রাণ পেল বিনোদ। ছেঁড়া ছাতা হাতে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ভিজতে ভিজতে এসে দাঁড়ালেন বিনোদের সামনে। কোলের কাছটা আর একটু খুলে ফেললো বিনোদ, এ লোকটা নিশ্চয়ই জরুরী কোন দরকারে কাপড় কিনতেই বেরিয়েছেন।

ভদ্রলোক ছাতাটা বন্ধ করে, কোঁচার খুঁট দিয়ে মাথা আর জামাটা মুছে ফেললেন। কাদা জল ছিটকে বিনোদের পসারেও একটু আধটু পড়লো। কিন্তু সে কোন আপত্তি করতে পারলো না। খদ্দের লক্ষ্মী, চটানো ঠিক নয়।

ভদ্রলোক এবার পকেট থেকে বিড়ি বার করলেন।

—নাঃ, দিশলাইটা ভিজে গিয়েছে, ধুত্তেরি—ওহে, দিশলাই আছে তোমার কাছে, দিশলাই ? দাও তো একটু—

বিনোদ কৃতার্থ হয়ে দেশলাইটা এগিয়ে দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ, এই যে আসুন।

বিড়িটা ধরিয়ে ভদ্রলোক একটা টান দিয়ে বললেন, কি বৃষ্টি দেখেছো, যত শালা বিষ্টি কলকাতা শহরে। যা না পাড়াগেঁয়ে যা না, কাজ হবে।

সায় দিয়ে বিনোদ বলল, দেখুন না, সারাদিন এক পয়সা বিক্রি নেই। ভদ্রলোক একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, কী কী আছে হে তোমার কাছে ?

এই মুহূর্তটির অপেক্ষা করছিল বিনোদ, চট করে খুলে ফেললো অয়েলক্লথটা —এই যে দেখুন না, শান্তিপুরী, ধনেখালি, দিশি তাঁতের। মিলেরও আছে, ছাপা—কী চাই আপনার বলুন, ব্লাউজ, সায়া, ফ্রক, প্যান্ট, সার্ট ?

একটা একটা করে তুলে দেখায় বিনোদ।

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়েন, ধুতি নেই, ধুতি ?

—আজ্ঞে, হাঁ, আছে বৈকি। দু'খানা তাঁতের ধুতি বার করে ফেললো বিনোদ।

—এ কি হবে ? আটপৌরে মিলের ধুতি চাই। আমাদের কী আর তাঁত পরার বয়েস আছে ? না পয়সা আছে ? তারপর হঠাৎ চটে গেলেন ভদ্রলোক—তুমি ত বেশ রসিক দেখছি, চাইলাম মিলের—

বিনোদ বিরস স্বরে বলে, আজ্ঞে মিলের আটপৌরে ধুতি শাড়ী তো কনটোল ছাড়া পাবেন না।

—সেটা আর নতুন কথা কি শোনালে বাপু ? দিতে পারতে মিলের, না হয় একটু বেশীই নিতে, তাই শুধোচ্ছিলাম। এমনি তো চোরাই মাল টাল, কি একটু আধটু ছেঁড়াটেঁড়া বিক্রী করো সব তোমরা।

বৃষ্টিটা একটু ধরে এসেছে, বিনোদের জবাবের অপেক্ষা না করেই—

ভদ্রলোক ছাতা খুলে এগিয়ে গেলেন।

বিনোদ আবার অয়েলক্লথটা চাপা দিল। কিনবে না ও। এমনি অনেক লোক আছে, যারা শুধু দেখে, দর করে, বাড়ী গিয়ে বা বন্ধু মহলে গল্প করার জন্যে। আর একদল আছে যাদের পকেট ভারী, কিন্তু হুঁশিয়ার, হঠাৎ সস্তা পেলে কিনে ফেলে। এ লোক তা নয়, দরটাই শুধোলো না।

হতাশ হয়ে পড়ে বিনোদ। খদ্দের এলে না হয় কেনা দামেই একটা কিছু ছেড়ে দিতো। রেশন তো কাল আনতেই হবে। রাতেই বা শুকনো রুটী খাবে কি দিয়ে ? অন্তত পেঁয়াজ তো দুটো চাই। হাত যে একেবারে খালি। মেয়েটা এতক্ষণ কাঁদছে আর পুষ্প ঠেঙাচ্ছে নিশ্চয়ই। কবে যে এ ক'টা দিন যাবে ? প্রতি বছরই কঠিন সময় এই পুজোর আগেটা।

হঠাৎ চমক ভেঙে গেল।

—শাড়ী আছে হে ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ আছে বৈকি, এই যে দেখুন। বলার সঙ্গে সঙ্গে এক ঝটকায় খুলে ফেলে বিনোদ অয়েলক্লথটা। খদ্দের-এ লোকটি ! হে ভগবান !

সবগুলো উলটে পালটে দেখে একখানা শেষে পছন্দ করলেন ভদ্রলোক।

—কী নেবে হে ?

—তিরিশ টাকা, আজ্ঞে।

—তিরিশ ? বলো কি ? নাঃ, তোমার কাছে হলো না আর।

ভদ্রলোক পা বাড়াতে মরিয়া হয়ে উঠলো বিনোদ।

কত দেবেন বাবু ? নিন ওখানা, না হয় দু'টাকা কমই দেবেন। সারাদিন বউনি হয়নি, বাবু।

ঘুরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক বললেন, বউনি হয়নি কি হে ? পাট তোলার সময় হলো যে।

বিনোদের মনে হলো লোকটি নিশ্চয়ই নিজেও ব্যবসা করে, না হলে বউনির কথায় কান দিতো না, দামটা নিয়েই কথা বলতো।

—আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু, কী আর বলবো বলুন। সারাদিন বিষ্টিতে সর্বনাশ করে দিলে।

—তা হঠাৎ দুটো টাকা কমিয়ে ফেললে যে। লাভ কি রকম করছো বলো দিকি। এতো বাপু কুড়ি টাকার বেশী হবে না মনে হচ্ছে।

—আপনার পা ছুঁয়ে বলছি বাবু, চুয়ান্ন টাকা জোড়া কেনা।

বিনোদ মরিয়া হয়ে পাটা সত্যি ছুঁতে যাচ্ছিল। সরিয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, ঠিক কত হলে দেবে বলো তো ?

—দিন, আটাশ টাকাই অন্তত দিন। সারাদিন বেচাবিক্রী নেই।

ভদ্রলোক শাড়ীটা হাত থেকে নামিয়ে রাখলেন আবার।—না বাপু পঁচিশ টাকার বেশী হবে না।

বিনোদ হাত জোড় করে উঠে দাঁড়ালো।—অন্তত কেনা দামটাই দিন বাবু।

—ওহে বাপু, ব্যবসা আমিও করি। টাকায় এক আনার বেশী লাভ করতে নেই, অধর্ম হয়। তুমি যে দাঁও মারতে চাও দেখি।

—আজ্ঞে, তাহলে বাবু অনেক টাকা বিক্রী আপনার। অনেক একশো টাকা আসে। আমার যে মোটে এই বাবু, সারাদিনে দু'খানা কি একখানা জোর। চারটে পেট তো চালাতে হবে, বাবু। জিনিস পত্তরের দাম তো দেখছেন—

বিনোদ অনুনয় করে কেনা দামটাই পাবার জন্যে। যেন বিশেষ অনুগ্রহ চাইছে, কৃপাপ্রার্থী সে।

ভদ্রলোকের মনটা বোধ হয় গললো একটু। বড়লোক বড়মানুষ বলে অনুগ্রহ চাইলে একটু অনুকম্পা জাগে বৈকি। তা ছাড়া নিজেও ব্যবসা করে

খান। পরন্তু আগের চেয়ে বেশী না হলে খরচা পুষিয়ে লাভ রাখা যায় ন- সে তিনি বোঝেন। তা দাম তো আগুন, কেনেও লোকে কম। সুতরা আগে যেখানে পাঁচশো পয়সা পেলেই চলতো সেখানে পাঁচশো আনার দরকার তাও বা পাঁচশো খদ্দের কোথা, একশোয় এসে ঠেকেছে। ওই একশোর কাঁ থেকেই পাঁচশো আনা তুলতে হয়। এসব তাঁর অজানা নয়। পাঁচশো আনা তুলতে হয়ই, হয় বেশী দামে বেচে, নয় তো ভেজাল মিশিয়ে, ঠকিয়ে কম মাল দিয়ে।

লোকটাকে বোকা-সোকাই মনে হচ্ছে। সত্যিই দামটা ছাব্বিশ সাতাশ হবে। কিন্তু সস্তা দরে জিনিস কেনার মধ্যে একটা গর্ব আছে। আর যেখানে সাতাশেতেই রাজী। সেখানে সাড়ে সাতাশ দিতেও মন উঠে না। তবু নিজে ব্যবসা করে খান। শেষ পর্যন্ত সাতাশ টাকা চার আনা দিয়েই বিবেককে বোঝ মানালেন তিনি। কেনাও হলো, মানও রইলো, দয়া দেখানোও হলো।

বিনোদও খুশী। চার আনা লাভ তো হয়েছে। সে তো কেনা দামেই দিতে তৈরী ছিল। একেবারে ফাঁকা গেলো না দিনটা। বিষ্টিটা ধরে গিয়েছে। আর কিছুক্ষণ থাকা চলে। কী জানি বউনি যখন হয়েছে, হঠাৎ দু-একটা খদ্দের এসে যেতে পারে।

পকেটে তুলে রাখতে গিয়ে কাঁচা টাকা একটা পড়ে গেল হাত থেকে। আওয়াজ শুনে চমকে উঠলো বিনোদ।—অ্যাঁ!

হাতে তুলে নিয়ে আবার বাজালো বিনোদ। তারপর সিমেন্টের ওপর বার পাঁচেক ঠুকে ঠুকে দেখলো অচল টাকাটা ঠাট্টা করছে, খট্ খটাস্ ঠক্, খাট।

ঘাম এসে গেলো বিনোদের। শেষ পর্যন্ত ঠকিয়ে গেলো লোকটা! আমারই ঘাড়ে চালালো অচলটা। জোচ্চোর, হারামজাদা। লাভ দিয়েছে শালা আমাকে! বারো আনা পয়সা লোকসান, ভঁাহা লোকসান। দিলি দিলি না হয় সিকিটাই অচল দিতিস। তাতেই শালা খুঁজে খুঁজে খুচরো দুটো টাকা বের করলো। কেন, নোট দিতে কি হয়েছিল? কী জানি তাই বা কে জানে, নোটগুলোও আবার অচল দিয়ে গেল কিনা।

নোটগুলো, খুচরো টাকা আর সিকিটা বার করে আলোর কাছে ধরে ধরে বাজিয়ে দেখে বিনোদ, শালাকে বিশ্বাস নেই আর।

চার আনা লাভের আনন্দে মশগুল হয়ে টাকাগুলো দেখে না নেওয়ার জন্য নিজেকেই এবার গাল দেয় বিনোদ, খা শালা, লাভ খা।

তবু অচল টাকাটা ফেলে দিতে পারলো না বিনোদ। যদি আট আনাও উশুল হয় বাসওয়ালাদের দিয়ে। দিনটাই অপয়া আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলো মনে নেই। হ্যাঁ, হয়েছে, সেই শালা কিপ্টেটা। হারামজাদাকে ধরে ঠেঙাবো এবার, ফের যদি কোনদিন ভোরবেলায় দেশলাই চাইতে আসে।

জিনিসপত্রগুলো বাঁধতে লাগলো বিনোদ দশটা নাগাদ। তবু টাকাটা হাতে এসেছে। কাল ভাতটা জুটবে।

মেয়েটা আবার কে? এদিকেই যে আসছে তাকিয়ে তাকিয়ে। আসুক, আজ আর বিক্রী করবে না সে। আর করেই যদি তো গলা কাটবে পেঁচিয়ে। শালা ভাল মানুষের দিন নেই। সবাই যদি ঠকাতে পারে সেই বা পারবে না কেন?

মেয়েটি এসে শুধোলো, শাড়ী আছে?

গম্ভীর গলায় বিনোদ বললো, আর হবে না, বেঁধে ফেলেছি সব।

—আমার যে বড্ড দরকার ভাই, দাও না একখানা।

গিঁটটা শক্তভাবে বাঁধতে বাঁধতে বিনোদ বললো, তাঁতের শাড়ী আছে সব, পঁয়ত্রিশ টাকার নিচে হবে না।

—তাই দাও ভাই, বড্ড দরকার, একটু ভাল দেখে দিও।

নাঃ নেহাৎ নাছোড়বান্দা। আবার পোঁটলার গিঁটটা খুলে বসলো বিনোদ। দেখি যদি লোকশানটা উশুল হয়। উপরের দিক থেকে একখানা শাড়ী টেনে বের করে দিলো।

মেয়েটি দেখলো না ভাল করে, শুধু বললো, রঙটা উঠে যাবে না তো?

কাউকে দেবে হয়তো জন্মদিনের উপহার। পেটে ভাত জোটে না লোকের, বিয়ে-পৈতেয় খাওয়াতে পারে না, তবু এই এক ঢঙ উঠেছে। আর বড়লোকের কাণ্ডই আলাদা। নিশ্চয়ই জন্মদিন, নয়তো এতো রাত্তিরে কেউ শাড়ী কিনতে আসে পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়ে? ভাদ্রমাসে যে বিয়ের দিন নেই সে আর কে না জানে।

মনে হচ্ছে চল্লিশ টাকা বললেও নিতো মেয়েটি, তবু পঁয়ত্রিশই বলে ফেললো বিনোদ।

চারখানা দশ টাকার নোট দিয়েছে। পাঁচ টাকার নোট একখানা ফেরৎ

দিলো বিনোদ।

মেয়েটি বাসের জন্তে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। রাস্তায় লোকজন খুব কম। জিনিসগুলো আবার বাঁধতে বাঁধতে বিনোদ তাকিয়ে দেখছিলো। হঠাৎ ডেকে বসলো, শুনছেন, ও দিদি ঠাকরুণ—

ফিরে তাকালো মেয়েটি। —আমাকে বলছো ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, শাড়ীখানা কি আপনার নিজের জন্তে নিলেন ?

—কেন বলতো ? কার জন্তে, তাতে তোমার দরকার কি ?

—বিনোদ বলে, আপনার নিজের জন্তে হলে, এই শাড়ীখানা বরং নিয়ে যান—

ক্রুদ্ধা মেয়েটি এগিয়ে এলো এবার। বললো,—বটে, রাত্তির বেলা একলা পেয়ে ইয়ার্কি মারতে এসেছো ?

বিনোদ অপ্রস্তুত হয়ে জোড় হাত করে বললো,—ছি ছি, কি যে বলেন দিদি ঠাকরুণ। মায়ের তুল্য আপনি—বলছিলাম কি, ও শাড়ীটা তত ভাল নয় কিনা—

—ও ? তবে দিলে কেন ? আরো রেগে উঠলো মেয়েটি।

—আজ্ঞে তা নয়—মানে, ওর দামটা তিরিশ টাকা। আপনাকে ইয়ে ঠকিয়েছি কিনা, ভেবেছিলাম কাউকে উপহার-টুপহার দেবেন—

মেয়েটি এবার অবাক হয়ে যায়। ঠকিয়ে আবার ফেরৎ দিতে চায়, এতো আচ্ছা পাগল দেখছি। বলে, কি করে বুঝলে উপহার-টুপহার নয় ?

—আজ্ঞে আলোয় দেখলাম কিনা, আপনার শাড়ীটা ছেঁড়া—সেলাই আগে ঠিক বুঝতে পারিনি। বোধ হয় কাল কোথাও যেতে-টেতে হবে আপনাকে—

বোকাবোকাভাবে হাত কচলায় বিনোদ।

———